প্রথম প্রকাশ ঃ চৈত্র ১৩৩৮

প্রকাশক
ময়ূখ বসু
গ্রন্থ প্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ মদন সরকার

দাম ঃ সাড়ে চার টাকা

রত্নদ্বীপ শ্রীলঙ্কা

॥ এক ॥

আকাশ এবং সমুদ্রের এখন ঘন নীল শোভা—যেন আর কোন দিন এমন করে চোখে পড়েনি। নির্মল সূর্যকিরণ চারিদিকের মহাবিশ্বপটের শোভাবর্ধন করছিল।

দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট গৈরিক প্রবাল-প্রস্তরের ছোট ছোট তটরেখা। তার বাইরে অন্তহীন ভারত মহাসাগরের দিগ্‌দিগন্ত চিহ্নহীন নীলিমার বিস্তার। সেই প্রবাল-প্রস্তরের এক একটি রেখা যেন রজ্জুর মত এসে মিশেছে রামেশ্বরমের ওদিক থেকে সিংহলের উত্তর তটপ্রান্তে। ধনুস্কোডি থেকে তালাইমান্নর। জাহাজ যাতায়াত করে তিন ঘণ্টায়।

পৃথিবীর যে কয়টি সুবৃহৎ দ্বীপ মানচিত্রে দেখতে পাই সিংহল তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ। সিংহল থেকে রামেশ্বরম দ্বীপটির মাঝখানে যে কয়টি প্রবাল প্রস্তরপিণ্ড মৈনাকের মত সমুদ্রতল থেকে মাথা উঁচু করে রয়েছে, সেগুলি প্রাকৃতের সেতুবন্ধন। বোধকরি সেই কারণেই পাশ্চাত্যের নাবিকেরা এককালে ওটার নাম দিয়েছিল 'আদমের সেতু'। ওর নামই চলে এসেছে।

বিমান থেকে নিচের দিকে এই বৃহৎ দ্বীপটির মানচিত্রটি অনুধাবন করছিলুম। দ্বীপটির আয়তন প্রায় সাড়ে পঁচিশ হাজার বর্গমাইল। উত্তর-দক্ষিণ লম্বায় ২৭০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিম প্রস্থে ১৪০ মাইল। ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী যে অগভীর উপ-সমুদ্র বিমান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটির নাম পক বা পাক প্রণালী। এপারের

পাখির ঝাঁক ওপারে যাতায়াত করছে যখন তখন। সমগ্র দৃশ্যটি এভাবে বর্ণনা করা চলে, এ যেন বিশ্বজননী ভারতের চরণ কমলের সঙ্গে মণিরত্নখচিত পাঁইজর বাঁধা।

এ বন্ধন প্রাকৃতের। এ আজকের নয়। মানব বংশ পরম্পরায় জন্মের ইতিহাসেরও অনেক আগে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ—তা হবে। হয়তো আদি কবি বাল্মীকির ত্রেতাযুগের কাল—মৈনাক যখন তাঁর মাথা তোলেননি রাজা রামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের আগে। হয়তো ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে লঙ্কা ছিল অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেই রূপকথা কোন ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। এখন কেবল এইটুকু সাহস করে বলা যায়, উভয় দেশের সংস্কৃতি, শিক্ষা, সামাজিক আচার, লেখনলিপি, অধ্যাত্ম চিন্তা, খাদ্য ও পোশাক, লোকপ্রকৃতি, বসবাসের রীতি ইত্যাদি একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

সিংহল আজও ডোমিনিয়ন, ইংরেজ প্রভুত্বের সঙ্গে সূত্রে বদ্ধ। আজও সে সভারেন্ রিপাবলিক না হয়ে উঠলেও আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে। রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি আজও গভর্ণর জেনারেল।

এবার সিংহল ভূখণ্ডের উপরে আকাশপথ দিয়ে বিমানটি মান্নার উপসাগরের সীমানা পেরিয়ে বিপুল কৃষ্ণবারিধি ভারত মহাসাগরের উপরে এসে পৌঁছল। নেমে এল দক্ষিণ আকাশের আরও অনেক দূরে। দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি ছুটে গেল—যেমন অপার বিশ্ব-বিস্ময় দুই চক্ষুকে অভিভূত করে, তেমনি গা ছমছমও করতে থাকে। শুধু মহাসাগর নয়—এ জলধির শেষপ্রান্তে দক্ষিণ মেরুও নয়, সে যেন আরও অন্য কোথাও। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজও সেদিকে অভিযান চালিয়ে সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনতে পারেনি। সিংহলের শেষ দক্ষিণ বিন্দুর নাম 'মাতারা'। ভারতের যেমন কন্যাকুমারী।

দক্ষিণ-পশ্চিমের আন্তর্জাতিক বন্দরনগরের নাম কলম্বো। কিন্তু

খাস কলম্বো বিমান বন্দর নয়। শহর থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে প্রায় সাগরতীরেই আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি 'কাটুনায়েকে' এবং কলম্বোর দক্ষিণে আট মাইল দূরবর্তী ঘরোয়া বিমানঘাঁটির নাম 'রাতমালানা'। আমরা বিদেশী বা ফরেনার, তাই আমাদের বিমান এসে নামল 'কাটুনায়েকের' বিমানঘাঁটিতে।

বিমানঘাঁটি কিংবা নারিকেল কুঞ্জবন,—এটি ভেবে উঠতে সময় লাগছিল বলেই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। এ ধরণের জন-বিরলতা বিমানঘাঁটিতে দেখা হায় না, এ নতুন। এ যেন আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী সেই দাহারান বিমানঘাঁটি। উত্তপ্ত বালুরাশির মধ্যে সেই ধূলি-রুক্ষতার প্রতপ্ত হওয়া, আর সেই বালুকণাযুক্ত বাতাসের থেকে মুখ ও দেহরক্ষার জন্য ঝালর ঘোমটা দেওয়া বেতুইনের পোশাক পরা কয়েকজন কর্মী ক্ষণে ক্ষণে ঝলসিয়ে যাচ্ছিল সেখানে আমার মুখ সেই গোধুলিকালে।

এ অন্য ভূবন। এ ভূখণ্ডে চিরবসন্ত বিরাজমান। এ যেন চারিদিকে উদার উদাস মধুরের তন্দ্রা জড়ানো স্বপ্ন। এ যেন বুদ্ধের পরম করুণায় নিমীলিত নেত্র। যতদূর দৃষ্টি যায় সমুদ্র বায়ুর তাড়নায় নারিকেল বনাঞ্চল নিত্য মুখরিত। আমি যেন এক নিস্তব্ধ ধ্যাননিবিড় রূপক রাজ্যের ক্রোড়ভূমিতে হঠাৎ ছিটকিয়ে পড়ে পথহারা হয়ে গেলুম।

আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটিতে পরদেশীদের পক্ষে নানাবিধ বাধ্য-বাধকতা থাকে, সেগুলি মেনে না চললে উপায় নেই। খানাতল্লাসী, প্রশ্নোত্তরমালা, বিদেশী মুদ্রা, স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট, আসবার উদ্দেশ্যাদি বর্ণনা, ভিসার মেয়াদ, সই-সাবুদ,—সেসব জটিল ব্যাপার। কোনও দেশে লাগে পনের মিনিট থেকে আধঘণ্টা, কোথাও বা তুঘণ্টার বেশী। একমাত্র দেখেছিলুম পশ্চিম বার্লিনে—তুমিনিটও লাগেনি। পালাম সান্তাক্রুজ, দমদম—এগুলিতে বিদেশীদের পক্ষে লাগে মিনিট দশেক

টুরিষ্ট ভিসা থাকলে লণ্ডনে লাগে পাঁচ সাত মিনিট, প্যারিসেও তাই! মস্কো সর্বাপেক্ষা সহজ, বিশেষ করে ভারতীয়দের পক্ষে। সবাই জানে ওদেশে প্রবেশপত্র পাওয়া দুরূহ। কিন্তু যদি কেউ পেয়ে যায়, তার পথ কুসুমাস্তীর্ণ। পশ্চিম বার্লিন থেকে পূর্ব বার্লিনের প্রবেশ পথে—যার নাম 'চেকপয়েন্ট চার্লি'—

সেখানে অনুমতি লাভের জন্য আমাকে দুঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এখানে এই সিংহল ভূমিতে পদার্পণ করে ওইটুকু সময়ের মধ্যে আমার মনে হয়েছিল, ভারতের প্রতি সিংহল ষোল আনা প্রসন্নচিত্ত নয়!

একে একে সবাই চলে গেল যে যার পথে। আমার খোঁজ নিচ্ছে না কেউ! কিন্তু আমারও কোন তাড়া নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণা আমার গায়ে লাগে না, লোকযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমি নিজেকে পরিত্যক্ত বা অসহায় বোধ করিনে, বিদেশের কোথাও পথ হারিয়ে গেলে আমি বরং আনন্দই পাই। আমি নিজের পথে চলতে জানি, জানি তখন কেউ না কেউ আমার হাত ধরবেই!

বিমানঘাঁটির লাউঞ্জে অনেক দেশের অনেক প্রকার ছবি এবং অনেক প্রকার আকর্ষণীয় প্রচারপত্রাদি সজ্জিত রয়েছে। সবগুলি একে একে দেখে এক সময়ে চোখ এসে দাঁড়াল রিসেপশনের কাউন্টারে। দুটি মেয়ে সেখানে কাজ করছে, এবং তাদের পিছনে বিশালাকার গৌতম বুদ্ধের একখানি ছবি। সেই ছবি চিরকালের সেই অপার করুণা আর মমতায় ধ্যাননিবিড়। একই সঙ্গে মনে পড়ে গেল গয়া, সারনাথ, এলিফ্যান্টা, অজন্তা, উদয়গিরি, সাঁচী, কলকাতা! কিন্তু মেয়ে দুটি? এ পোষাকের মেয়ে দেখেছি শুধু কেরালায়। গায়ে জড়ানো মিহি উড়নি, পরনে বুদ্ধবর্ণের ঘাগরা। আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটিতে সুশ্রী ও লাবণ্যময়ী মেয়েরা সহজে কাজ পায়।

কোনও দেশেই কুরূপা বা স্বাস্থ্যহীনা মেয়ে হোস্টেস হয় না,—এটি যেন নিয়ম বাঁধা। শুধু তাই নয়। পোষাকে ও প্রসাধনে পুরুষের লোভ যেন কাজ করে। চাহনি ও কটাক্ষ কিছু বিলোল হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি যাত্রীর প্রতি ব্যবহারের যেন কিছু ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়! মৃদু হাসির সহজাত চাতুর্য যেন পুরুষের বক্ষোরক্তে দোলা দেয় না, আর বলব না, আরও অনেক আছে।

এ মেয়ে দুটিকে দেখে থমকিয়ে গেলুম। এরা অন্য মেয়ে। প্রসাধন নেই, শুধু সদ্যস্নাত। দেহের আঁকবাঁক অথবা অনাবৃত দেহবল্লবীর নধর পেলবতা দেখাচ্ছে না—দুটি নারী যেন সিংহলের সুমার্জিত রুচিশীলতা ও শালীনতার অভিব্যক্তি। এরা যেন সেই বুদ্ধ-কালের সুজাতা ও আম্রপালি। তপস্বিনী আর অনুরাগিনী দুই মিলে যেন রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে।

উঠে গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালুম। ওরা সাগ্রহে খুঁজে পেতে আমাকে হাই কমিশনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল।

এ যেন এসে পৌঁছলুম সোনার বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। হরিৎ-শোভা সর্বত্র, নিবিড় ঘন বনময় গ্রাম, আধপাকা আধকাঁচা চাষীর ঘর। সাধারণ চাষী মানেই দরিদ্র, এটি এখানে সত্য নয়। গ্রামের পথঘাট যেমন চাকচিক্য বহন করে, চাষীর স্বাস্থ্য ও পোষাক তারই পরিচয়। উলঙ্গ শিশু, হাড়-পাঁজরা বের করা গরু বাছুর, স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন মেয়ে,— এরা দেশের দারিদ্রের প্রতীক। সেই দারিদ্র এখানে চোখে পড়ছে না। পুরুষের পরণে শাদা লুঙ্গী ও হাফসার্ট, মেয়েদের গায়ে জামা ও দেশী গাউন! শাড়ি ওদের পোষাকী। প্রতি গৃহস্থের উপার্জন নারকেল গাছ থেকে। ঠিক কেরালার মতন। নারকেলের ছোবড়া, খোলা, জল, নারকেলের দুধ, ছিবড়ে, নারকেল

বাটা, নারকেল তেল এবং নির্যাস।

নির্যাস? সে আবার কি?

রামকৃষ্ণ মিশনের এক সিংহলী স্বামীজি বললেন, সে একপ্রকার রস—ওর থেকে তৈরী হয় দেশী মদ। তার নামক 'আরক।' যেমন ভারতের যোয়ানের আরক। এদেশে আরক একটা প্রধান পানীয় এবং এরা সেই আরক সপরিবারে খেয়ে বৌদ্ধ দর্শনে বুঁদ হয়ে থাকে। উত্তর ভারতে হিমালয়ের মধ্যেও এই প্রকার গৃহজাত পানীয় দেখা যায়, তার নাম চ্যাং। চ্যাং-এর সমাদর হিমালয়ের সমস্ত অঞ্চলে।

সমগ্র সিংহলে সর্বত্র এই আরক-এর দোকানগুলিকে বলা হয় 'আরক ট্যাভার্ন্'। ইউরোপে যেন তৃষ্ণার্তদের জন্য সর্বত্র পাওয়া যায় বীয়র। ইনন্, ট্যাভার্ন্—এসব ভারতে নেই বললেই হয়।

কলম্বো দেখে বেড়াচ্ছিলুম। ভারত মহাসাগরের উপকূলে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত কলম্বো বন্দর,—যার কোনও আড়াল-আবডাল নেই। সমুদ্রের পশ্চিম উপকূল ধরে সুদূর উত্তর থেকে সুদূরতর দক্ষিণে এই সুন্দর নগর প্রসারিত। কিন্তু ফোর্ট কলম্বো হোল নগরের মধ্যমণি। যেমন ফোর্ট বোম্বাই। তফাৎ নেই, ফোর্ট বোম্বাই সমুদ্রের খাঁড়ি দিয়ে ঘেরা,—যে খাঁড়ির পচা আঁসটে গন্ধ সর্ববিদিত। মাদ্রাজের মত সুন্দর শহরেও ওই প্রাকৃতিক অভিসম্পাৎ। শুনতে পাচ্ছি ওই সাংঘাতিক দুর্গন্ধের থেকে নগরের স্বাস্থ্যকে বাঁচাবার জন্যে মাদ্রাজের পৌরসভা বিশেষ ব্যবস্থার কথা ভাবছেন। কলম্বোতে এ বালাই নেই। ফোর্ট কলম্বোর চেহারা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শহরকে মনে করিয়ে দেয়। প্যারিসের যে চওড়া পথটার নাম 'সাঁফ্ ইলিজে'—যেটা আর্ক-ডি-ট্রম্প্ থেকে নেপোলিয়নের মূর্তি পর্যন্ত প্রসারিত—ওটাকে বাদ দিলে কলম্বো কম যায় না। তবে হ্যাঁ, প্যারিস প্যারিসই—পৃথিবীতে তার জুড়ি নেই। ফোর্ট কলম্বোর নিজস্ব সৌন্দর্য দেখতে খুব ভাল লাগে। কলকাতার চৌরঙ্গী ও এককালের সাহেব পাড়ার

কী এবং কতটুকু আছে বর্তমানে? ফোর্ট বোম্বাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং মেরিন ড্রাইভ—কলকাতাকে ম্লান করে দিয়েছে। শহরতলীকে কিংবা দেশীয় নাগরিকদের বসবাস-পল্লী-গুলিকে না দেখলে সেই দেশের প্রকৃত কালচারকে চেনা যায় না। কলম্বোর বাইরে গেলে পরিচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থা চোখে পড়ে। এ নগরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠতা মিলিয়ে রয়েছে।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মধ্যযুগীয় যে ইতিহাস, সিংহলে তার ব্যতিক্রম হয়নি! সেই বণিক-শাসকের পুরনো কাহিনী। আরব, পারস্য, চীন, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, জার্মান, ফরাসী, এমন কি মূর পর্যন্ত। অবশেষে ইংরেজ এসে সিংহলের দখল নিল ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে। কলম্বো তার নাম বদলেছে অনেকবার। প্রাচীন সিংহলী শব্দ ছিল 'কোলাম্বা' অর্থাৎ আম্রপত্রঘেরা বন্দর। চীনেরা বলেছিল, 'কাও-লান-পু'—যারা ওখানে বাণিজ্য করত। পর্তুগীজদের এক পাদরী এসে নাম দিল, কোলুম্বো! পর্তুগীজরা ছিল দেড়শ বছর, ওলন্দাজরাও প্রায় তাই! ওরা সবাই রেখে গেছে ওদের কয়েকটা দুর্গ, ঘাঁটি এবং গোটা কয়েক গির্জা। ঠিক ভারতেরই মত ইতিহাস। আগে আসে বণিক, পরে আসে পাদরি, তারপর আসে রাজদণ্ড। ইংরেজরাও থেকে গেছে দেড়শ বছর।

কলম্বো দেখে বেড়াচ্ছিলুম। সরকারি প্রাসাদ বা বৃহৎ অট্টালিকা মাত্রই বৃহত্তর বাগান দিয়ে ঘেরা। যেমন দেশপ্রসিদ্ধ 'সমুদ্র' হোটেল, যেমন টাউন হল আর মিউজিয়ম, যেমন পার্লামেণ্ট প্রাসাদ, যেমন সেনেট বিল্ডিং, যেমন সিলোন রেডিয়ো। চারটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে সমগ্র সিংহলে। কাণ্ডি নগরের বাইরে পেরাডেনিয়ায় যে বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখেছি, সেটি যেন এক বৃহৎ উদ্যান নগরী। এটি নগরের সকল কোলাহল থেকে দূরে, একটি অরণ্য পরিবেশের মধ্যে। সামনে দিয়ে চলে গেছে ঢেউ-খেলানো অরণ্যপথ—যেন ছোটনাগপুরের

কোনও বনময় পথে এসেছি। যতদূর দৃষ্টি যায় নারিকেল, আম, কলা, সুপারি, কাঁঠালের বন। এ ছাড়া বনময় দীঘি, যাদের টলটলে জল কাঁচের মত স্বচ্ছ। হাজার হাজার বড় বড় গাছ, যাদের সকলের নাম আমার জানা নেই। ভিতরে ভিতরে বিরাট একেকটি অট্টালিকায় ছাত্রাবাস। প্রান্তরে-প্রান্তরে খেলার মাঠ। কথায়-কথায় ক্যানটিন। একেকটি অট্টালিকার মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরস।

অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজ দেখেছি বৈকি। এক একটা শহরে কুড়ি পঁচিশটে করে কলেজ। বড় বড় কলেজগুলোয় ঢুকলে দেখতে পাওয়া যায় সারাদিন বেড়িয়ে বেড়ালেও ফুরোয় না। লণ্ডনের হট্টগোল নেই বটে, কিন্তু শহর-বাজার যানবাহন কম কি? ওরা সবাই জানে নগরে কোলাহল এবং রাজনীতিক হুজুগ ছাত্রজীবনের পক্ষে বিষ! এইটি মনে রেখে সিংহলের বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যৎকালে ছাত্র বা ছাত্রীর জীবন যে ছাঁচেই গড়ে উঠুক, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় তাদের শিক্ষা অনেকটা সাধনার মত। সেই সাধনার যেটি প্রধান ক্ষেত্র, তার চারিদিকে একটি শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে।

এরপর আরও আছে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। একটির নাম বিদ্যোদয়, অন্যটি বিদ্যালঙ্কার, তৃতীয়টি কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়। উপরোক্ত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ই কিন্তু হাল আমলের। গত তিরিশ বছরেরর মধ্যে এগুলি নির্মিত। অথচ অবাক হতে হয়, সমগ্র সিংহলে লেখাপড়া জানা মেয়েপুরুষের সংখ্যা জনসংখ্যার ৭১ অংশেরও বেশি। যে সংবাদটি শুনলে ভারতীয় মাত্রই একটু অবাক হবে। ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গে লেখাপড়া জানা মেয়ে পুরুষের সংখ্যা জনসংখ্যার ৩০।৩২ এর বেশি নয়।

পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালার মত ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্য অপেক্ষাও যে দেশ ক্ষুদ্রতর, সেই দেশে অগণন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা দেখে

আমি যেন কতকটা হতবুদ্ধি হয়েছিলুম। প্রধানত তিনটি ভাষায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হয়। সেগুলি সিংহলী ও তামিলী ও ইংরেজী। 'লেক হাউস' নামক একটি বিশাল অট্টালিকা—যেটি কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সমতূল্য—সেটি কয়েকটি সংবাদপত্রের আপিস। আমাদের যেমন আনন্দবাজার বা অমৃতবাজার গ্রুপ ওখানেও তেমনি সর্বপ্রধান গ্রুপ হোল সান্ গ্রুপ। এঁরা অনেকগুলি দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। যে কোনও দৈনিক ছাপা হয় দেড় থেকে তিন লাখ, মাসিক দুই থেকে তিন লাখ, গল্পের সাপ্তাহিক দেড় লাখ, কবিতার সাপ্তাহিক সত্তর হাজার থেকে এক লাখ--এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধীয় পত্রপত্রিকা। ইংরেজী বইয়ের বিক্রির বাজার দেখে আমি অবাক। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে ওরা খোঁজখবর রাখে। কিন্তু এই দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ পড়ে কিনা আমি সন্দেহ করি।

এই সান গ্রুপের যিনি সর্বোচ্চ অধিপতি অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং পরোক্ষ স্বত্বাধিকারী তাঁর নাম মিঃ ধনপাল। তিনি প্রবীণ বয়স্ক এবং মিষ্ট স্বভাবা। তিনি নাকি চট করে কারও সঙ্গে দেখা করেন না শুনেছিলুম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য যে ব্যক্তিই হয়, সেই ব্যক্তির নাম ছাপা হয় কাগজে কাগজে।

আমাকে এড়াবার উপায় ছিল না, কেননা ভারতীয় হাই কমিশনের অজয় গুপ্ত ছিলেন আমার সঙ্গে। কয়েকজন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন রিপোর্টার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি জানবার চেষ্টা করেছিলুম শ্রীমতী বন্দরনায়েক পুনরায় ক্ষমতায় আসতে পারেন কিনা। সেটি ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কথা। সিংহলের সাধারণ নির্বাচনের দুমাস আগে। তাঁদের জবাব ছিল অস্পষ্ট, এবং 'ভারতীয় ব্যক্তির কাছে হয়তো মন খুলে কথা বলাটা তাঁরা পছন্দ করেন নি।

তাঁদের প্রশ্ন ছিল স্পষ্ট, অর্থাৎ ভারতে যেরূপ রাজনীতিক ডামাডোল দেখা যাচ্ছে, নানাবিধ ধ্বংসাত্মক শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে, তাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হালে পানি পাবে কিনা। আমার জবাব ছিল স্পষ্টতর। ভারত চাইছে একটা নতুন জীবন, চাইছে পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তন, চাইছে একটা দুঃসাহসিক কর্মসূচী। শ্রীমতী গান্ধীর কথাবার্তায় ভারতীয় মন উৎসাহিত বোধ করছে। যদি এর মধ্যে সর্বভারতীয় নির্বাচন ঘটে, তবে তিনি নিশ্চয়ই জয়লাভ করবেন। তাঁর গতি কোন মতেই রোধ করা যাবে না।

পরদিন আমার কথাগুলি ওঁরা কাগজগুলোয় ছেপে দিলেন।

।। দুই ।।

আপাতত আমাকে কলম্বো ছাড়তে হচ্ছে। অনতিবৃহৎ একটি দ্বীপরাষ্ট্রের পক্ষে কলম্বোর মত বৃহৎ এবং আধুনিক একটি নগর কম কথা নয়। এ যেন আমার মনে ছবি এঁকে রাখল বহুকালের মত।

সিংহলে প্রবেশ করার আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আমি বলেছিলুম এটি হবে আমার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ভ্রমণ। তাঁরা বলেন, না, ওকথা বললে আপনার পক্ষে ফরেন এক্সচেঞ্জ পেতে দেরি হবে। বলুন তীর্থ করতে যাবেন।

ওঁরা ঠিকই বলেছিলেন। পৃথিবীর যেকোনও দেশের যেকোনও পথই তো তীর্থপথ! অগণিত যুগ যুগান্তরে মানব বংশ পরম্পরায় পায়ের চিহ্ন সকল দেশে, সকল জনপদে, পথে ও প্রান্তরে, নদীতটে ও সমুদ্রের তীরে তীরে। তাদেরই সেই পায়ের চিহ্ন ধরে যাওয়া, সেই তো তীর্থ বিচরণ।

মোটর পথে কলম্বো ছেড়ে যাচ্ছিলুম। যেন ভেসে যাচ্ছিলুম কোনও একটা স্বপ্নলোকের আবছায়া পথ ধরে। শীতের কাঁটা রয়ে-গেছে আবহের মধ্যে, কিন্তু অনাদ্যন্ত কাল ধরে একই বসন্ত-সমীরণ প্রবাহমান রয়েছে সমুদ্রের বালুবেলায় আর সংখ্যাতীত প্রবাল-মৈনাকের ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ায়—এ দৃশ্য আনন্দদায়ক। অনন্ত নারিকেল বন দিগন্তের দিকে যেন দিশাহারা ব্যাকুলতায় আকুলিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

আমাদের মোটর চলে যাচ্ছিল।

এই নিত্যসূর্যকরোজ্জ্বল ঘন নীল সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ-রাষ্ট্রটির সুপ্রাচীন নাম হোল লঙ্কা। মধ্যযুগে কেউ এ ভূভাগের নাম দিয়েছিল

শ্রীলঙ্কা—কারণ শ্রী, শোভা, সম্পদের প্রাচুর্য এবং সর্বাঙ্গীন ফলন-শীলতা—একে সমৃদ্ধ করে রেখেছে কালাতীত কাল ধরে। এই রাষ্ট্রের চারিদিকে অগভীর সমুদ্র জলের তুলনায় অনন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। যারা কাঁচ বাঁধানো নৌকায় চড়ে সাগরের কোলে কোলে বিচরণ করছেন তাঁরা তাঁদের লঞ্চে বসে পায়ের নীচে জলের ভিতরে দেখছেন সমুদ্রের মধ্যে প্রাকৃতের অনন্ত ও অব্যয় সম্পদ-রাশি। জলের নীচে অগণিত প্রবালের দ্বীপ, উদ্ভুত রকমের বিভিন্ন বর্ণের উদ্ভিজ্জ, জীবন্ত বিচিত্র জন্তু, শামুক ও অতিকায় পোকা, অদ্ভুত লেজ-ওয়ালা জানোয়ার, হাঙ্গরের দল চলেছে ভিতরে ভিতরে তাদের খাদ্য শিকারের অন্বেষণে, জলের তলায় পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নাম-না-জানা অতিকায় মাছেরা বাসা পেয়ে বসেছে আপন মনে, কোথাও-কোথাও জলের তলায় দপদপিয়ে জ্বলছে মুক্তাবহ বৃহদাকার শামুক —লঞ্চের তাড়নায় জন্তুরা চলে যায় গভীর রহস্যলোকে। এই সমুদ্রাঞ্চলগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'কোরাল গার্ডেনস'।

সিংহল সমুদ্রতীরলোক চারিদিকে এক হাজার মাইলেরও বেশি দীর্ঘ তার আবেষ্টনী, এবং তাদের প্রধান আকর্ষণ হোল জনবিরলতা। ভারত উপ-দ্বীপের সমুদ্রতীর কম বেশি প্রায় চার হাজার মাইল শুধু টানা দূরত্বে। কিন্তু জনসংখ্যা তার এত যে কোথাও নিভৃত নিরালা নয়। আগে পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় অতটা জনসমাগম হোত না। আজকাল সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, অমন যে পুরী, গোপালপুর, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, বেদারণ্যম, টিউটিকোরিন, তিরুচেন্দুর, কন্যাকুমারী—সর্বত্র গাঁদি-গাঁদি লোক। এসব সী-বীচে বিদেশীরা হাজারে হাজারে দল বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপাঝাঁপি করতে চায় না। একমাত্র দেখলুম কোবালম বীচে বিদেশিনীরা অল্পসল্প 'বিবস্ত্রা' হয়ে জলে নামে। কিন্তু সিংহল সমুদ্রতীরে চক্ষুলজ্জার বিশেষ বালাই নেই। মাউন্ট লাভিনিয়া, কালুতারা, বেনতোতা

থেকে হিক্কাডু বা বেলিগামা, তাঙ্গেল, অম্বালন গোড়া, ড্রোনড্রা, কিরিন্দা, ইয়ালা, বাত্তিকালোয়া—তারপর সোজা উত্তর তীর ধরে ত্রিন্‌কোমালি। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমগ্র বেষ্টনী। মেয়েই হোক, পুরুষই হোক, সর্বপ্রকার সামাজিক জীবন থেকে মুক্তি। আকাশের নির্মল নীলিমা, বসন্তের মধুর ঘুমপাড়ানি বায়ুর দোলা, চারিদিকের বন-শোভার মধ্যে সাগর তীরভূমির জনবিরলতা, নিসর্গের অনন্ত সৌন্দর্য চারিদিকে, এরা যেন সব মিলিয়ে অপ্সরা নারীদেরকে আনগ্ন হবার আমন্ত্রণ জানায়! লজ্জা, মান, ভয়, সঙ্কোচ, এরা যেন একটির পর একটি করে খসে পড়তে থাকে, এবং অবশেষে ওরা সুকোমল দেহ-লাবণ্যের সঙ্গে প্রাকৃতের সকল শোভার মধ্যে মিলে যায়। শিল্পী-সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, পুরুষের চোখে লোভ থাকতে আনগ্না যুবতীর দিকে তাকাবার অধিকার নেই! ওদিকে যে কোনও রমণীকে প্রশ্ন করলে সে বলবে, দশ হাজার জন পুরুষের মাঝখানে সে নগ্ন হতে দ্বিধা করবে না, কিন্তু একটিমাত্র পুরুষের সামনে সে বিবস্ত্রা হতে নারাজ।

সে যাইহোক, সিংহলের ইতিহাস ভারতের মত রামায়ণ বা মহাভারতের থেকে উদ্ভুত হয়নি। ওদের ইতিহাস হোল 'মহাবংশ'। এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছে বিগত আড়াই হাজার বছরের রাজ-কাহিনী। সেই কাহিনীর প্রারম্ভ হোল উত্তর ভারত থেকে আগত আর্যজাতির লঙ্কা অভিযান। তৎকালীন ভারতের রাজপুরুষরা লঙ্কায় প্রবেশ করে আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সূত্র ধরেই ভারতের সঙ্গে লঙ্কার আদিবাসীদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। এর সঙ্গে আসে সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। ধীরে ধীরে লঙ্কায় একটি নতুন সভ্যতার বিস্তার ঘটে। ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধ সভ্যতা আধিপত্য লাভ করেছিল মৌর্য সাম্রাজ্য ও তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত, তার প্রথম আরম্ভে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র

ও তার পরে কন্যা সঙ্ঘমিত্রা একটি বোধিদ্রুমের চারা নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে লঙ্কায় প্রবেশ করেন। সেই মন্ত্র হোল বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। বৌদ্ধ অনু-শাসনের এই শ্লোগানটি মূলত তৎকালীন রাজনীতিক বলেই ধরা যেতে পারে। কিন্তু এই রাজনীতির সঙ্গে যে অহিংসা, তিতিক্ষা, করুণা, যোগসাধনা ও মানব কল্যাণের আদর্শ নিহিত ছিল, লঙ্কাদ্বীপের জনজীবন সেটিকে দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায়। ভিন্নপ্রকার রাষ্ট্রদর্শন ও তথাকথিত অন্য ধর্ম ছিল না বলেই লঙ্কার তৎকালীন অধিবাসীরা বৌদ্ধদর্শন বা বৌদ্ধধর্মকে একমাত্র জাতীয় ধর্ম বলে গ্রহণ করে। একথা তারা বুঝতে চায়নি যে ভারতীয় সনাতন ধর্মেরই একটি শাখা হোল বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যা। রাজকুমার সিদ্ধার্থের পিতা ছিলেন সনাতনধর্মী।

বৌদ্ধদর্শনকে এরা আঁকড়িয়ে ধরেছিল কাঙ্গালের ধনের মত। সেই কারণে ভারতবর্ষ যখন বিভিন্ন দর্শনবাদ নিয়ে শত শত বছর ধরে সমীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগল, ওরা তার দিকে ফিরেও তাকাল না! ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার ধর্ম-বিরোধের থেকে গা বাঁচিয়ে ওরা ওদের চারিদিকে বেড়া বেঁধে রইল। ওরা বৌদ্ধদর্শনকে করতে রাখল নিষ্কলুষ ও অবিমিশ্র। আজও তাই আছে। যতদূর অনুমান করে পারি পৃথিবীর অপর কোনও দেশে—বিশেষ করে দক্ষিণ ও সুদূর প্রাচ্যে—কোথাও সিংহলের মত এমন নিরঙ্কুশ বৌদ্ধ জনসমাজ চোখে পড়ে না! আজও এই বিংশ শতকের প্রায় শেষ পাদে দাঁড়িয়ে সিংহলের শিক্ষার ধারা, দার্শনিক অনুলোচনা, চিন্তাভ্যাস, বিজ্ঞান গবেষণা, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, নাটক, লোকগীতি বা লোকসাহিত্য, উপকথা, রূপকথা এবং সকলের উপর রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রধর্ম—আগা-গোড়া সমস্ত বৌদ্ধনীতিকেন্দ্রিক। কোনও নতুন কবি বা কথাকার বা কলাকার,—কেউ বৌদ্ধ চিন্তার বাইরে দাঁড়িয়ে অত্যাধুনিক

ভাবধারার অনুগামী হবার সুবিধা পায় না। নাস্তিক বা ঈশ্বর বিদ্বেষীর ঠাঁই আছে সিংহলে, কিন্তু বৌদ্ধ বিদ্বেষীর পক্ষে সিংহলে বাস করা অসুবিধাজনক।

ঠিক যেমন আরব দেশে ঘটেছিল। পয়গম্বরের আবির্ভাবের পর থেকে যারা ইসলাম ধর্ম ও দর্শন গ্রহণ করেছিল, তারা বিগত দেড় হাজার বছরের মধ্যে তিলমাত্র আদর্শচ্যুত হয়নি! তাদের প্রথম প্রেম ইসলাম, তাদের জীবনের মূলনীতি ইসলামীয়, তাদের সমগ্র সাহিত্য, কাব্য, শিল্প ও সংস্কৃতি ইসলামের ঐতিহ্য বহন করে, এবং তাদের রাষ্ট্র মাত্রই ইসলামপন্থী। ভারতবর্ষে আসি। গুরু গোবিন্দ গুরু নানকের শিখ সম্প্রদায়। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে দাঁড়িয়ে দেখেছি এও সেই বৌদ্ধদর্শনের মত শাখায়িত শিখদর্শন— যার মূল হোল গুরুগ্রন্থ সায়েব।

ভারত বা ভারতীয় মানে হিন্দু নয়। হিন্দু একটি সংজ্ঞা মাত্র। হিন্দুকে গালি দিলে মামলাও বাধে না, কেউ ছুরিও মারে না। ভারতের ধর্ম বড় নয়, বড় হোল সংস্কৃতি। যেখানে মানবতার অপার মহিমা, সেখানে ভারত! ভারতের মূল অধ্যাত্ম-চিন্তা উঠে আসছে কল্পান্তের শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে। বেদ ছিল মুখ থেকে মুখে। শ্রুতি থেকে স্মৃতিতে। তার বয়স নেই, কাল নেই, ইতিহাস নেই, সাক্ষ্য নেই। তার উৎপত্তিকাল নির্দিষ্ট নয়। বেদ, উপনিষৎ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত,—শ্রুতি আর স্মৃতি ছাড়া কি আর কিছু? আমি জানিনে। ভারতের সংখ্যাতীত যোগ-সাধকদের মধ্যে রাজ-কুমার সিদ্ধার্থ বিশেষ একটি ভাবনার সূত্র ধরে আলোকপ্রাপ্ত বা বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। সনাতন ভারতে কোথাও সাকার পুতুলের পূজা কেউ করেনি। গৌতম বুদ্ধের পর ভারতে মূর্তি বা পুরাকীর্তি প্রথম আকার লাভ করে। কিন্তু এও আমার অনুমান মাত্র। এর ঐতিহাসিক তথ্য আমার সঠিক জানা নাই।

ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলুম ওদের দেশের ভিতরে ভিতরে।

'নেগম্বো' নামক ছোট সমুদ্র-জনপদটি আমার হাতের কাছেই। বিমান থেকে 'কাটুনায়েকে' নামক যে আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটিতে নেমেছি, তার থেকে মাইল দুই উত্তরে 'নেগম্বো'। এটি সমুদ্রের খাঁড়ির মধ্যে একটি মৎস্য কেন্দ্র। বোধহয় মাছের গন্ধেই ওলন্দাজরা এখানে এসেছিল ১৭শ শতকের মাঝামাঝি। তারপর যখন শিকড় নামিয়ে বেশ শক্ত হয়ে ব্যবসা বাণিজ্য জমিয়ে বসল, তখন একটি প্রকাণ্ড দুর্গ নির্মাণ করল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রথম কাজই হোল দুর্গ নির্মাণ। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম আজও তার সাক্ষী। ইংরেজ এসে ডাচদের তাড়াল ১৮শ শতকের শেষ প্রান্তে।

ওলন্দাজরা গেমোতে একটি অতি রমণীয় প্রশস্ত জলনালী কাটে। এটি খাল। দুপাশে ছবির মত একটির পর একটি মৎসজীবীদের গ্রাম, নারকেলকুঞ্জে ঘেরা। ওরই মধ্যে একটি বনময় অংশের ওলন্দাজরা নির্মাণ করে রেখে গেছে মস্ত একটি গির্জা, যার নক্সাটা আধুনিক কালের সঙ্গে মেলে না।

কলম্বোর বা কাটুনায়েকের উত্তর দিকে যেমন নেগম্বো, ঠিক তেমনি দক্ষিণ পশ্চিম সাগরতীরে হিক্কাড়ুয়া জনপদটি পেরিয়ে গেলে 'গল' বা 'গল্লে'। সামনে পারাবারহীন অনন্ত সমুদ্র, যার দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন গা ছমছম করে। পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে জানি হাজার মাইল পূর্বদিকে আছে ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই সমুদ্রে দাঁড়ালে জানি পশ্চিমে আরব সাগর। পেরোতে পারলে হয় মালাগাসি, নয়তো আফ্রিকা। কিন্তু, গল্, বেলিগামা বা সাতারার তীরে দাঁড়ালে পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে—কোথাও কোনও আশা ভরসা নেই। গল্-এ একটি সুপ্রাচীন দুর্গের অর্ধলুপ্ত অবশেষ চোখে পড়ে। সিংহলবাসীরা অনুমান করে এটি বাইবেল রচনার যুগের। খৃষ্টের দেহত্যাগের পরে যখন প্রথম সিংহল ও ভারতের দিকে খৃষ্টের

অনুগামীরা অভিযান করে—সে প্রায় সাড়ে উনিশ বছর আগের কথা,—ইউরোপ যখন খৃষ্টের আবির্ভাব-তিরোভাবের খবরও রাখে না—সেইকালে যারা খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রথম আসে ভারতে, তাদেরকে আজও বলা হয় 'সিরিয়ান খৃষ্টান'। এরা প্রধানত বাস করে কেরালায়। এরা রোমান্ ক্যাথলিক বা প্রোটেষ্টান্ট—কোনও দলেরই ভুক্ত নয়। যতদূর অনুমান করতে পারি, গল্-এর এই দুর্গ তারাই নির্মাণ করেছিল বৌদ্ধদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য। এটির নাম 'তার্শিশ'। যে যাই হোক, এই তার্শিশ দুর্গটি দক্ষিণের সমুদ্রপথে বোধকরি অনেকদূর থেকে দেখা যায় বলেই একদা সেদিনের পর্তুগীজ নাবিক ঝড়ের সমুদ্রে আহত প্রতিহত হয়ে এই দুর্গের নিকট এসে তাদের পালতোলা নৌকা থেকে অবতরণ করে। সেটি ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ। বলা বাহুল্য, সেইটিই হোল প্রথম ঔপনিবেশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রারম্ভ।

গল্-এর কথা উঠলে আগেই বলতে হয় এটি সুগন্ধী মসললার দেশ। এখানে ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দালচিনি, জোয়ান-মৌরী ইত্যাদির অজস্র ফলন ঘটে। বিশেষ করে ছোট এলাচ ও লবঙ্গের। কলকাতায় এখন ছোট এলাচ ও লবঙ্গ সাধারণ বাজারে দুশ টাকায় এক কেজি, কিন্তু সিংহলে শুনেছি ওগুলো চার বা পাঁচ টাকা। সেইকালের সেই পর্তুগীজরা, যারা দক্ষিণ ও সুদূর প্রাচ্যে জলদস্যু নামে প্রখ্যাত ছিল, যারা চব্বিশ পরগণা, হুগলী, সুন্দরবনাঞ্চল ও চাঁটগা-বরিশালের নদী-সমুদ্রপথে ডাকাতি করতে অভ্যস্ত ছিল, সেই তারাই এই গল্ থেকে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যেত ছোট এলাচ আর লবঙ্গ, হাতীর দাঁত আর সমুদ্রের মণিমুক্তা ও চুনিপান্না এবং নানান জহরৎ। এখানে প্রসিদ্ধ হোল, চন্দ্রমণি আর শ্বেতমণি,—যার রং বদলাতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। আর আছে বৈদুর্যবর্ণ মাছের শামুকের ও সামুদ্রিক একপ্রকার কাঠুয়ার খোলা—যার রঙের সংমিশ্রণ প্রতি

ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে।

লুণ্ঠনে যারা অভ্যস্ত ছিল, সেই পর্তুগীজদের সবটাই নিন্দনীয় ছিল না। তারা অধিকাংশ নিজেদের প্রয়োজনেই সেদিন স্থানীয় অধিবাসীদের দিয়ে কুটীর শিল্পের প্রচলন করে। স্থানীয় লোকেরা জানতো কেমন করে বিশেষ বিশেষ মণিরত্নাদি পালিশ করতে ও ছিলা কাটতে হয়। মহামূল্যবান নীলমণি (Sapphire), যার স্বচ্ছ নীলাভা জগৎপ্রসিদ্ধ এবং সমগ্র পৃথিবীতে সিংহলী নীলমণি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাছাড়া স্বর্ণাভ জিরকন্, মাতারার দুষ্প্রাপ্য হীরক, অতি মূল্যবান প্রবালের সংগ্রহ, বিভিন্ন প্রকার মুক্তো, এগুলি তৎকালে কোটি কোটি বিদেশী মুদ্রায় ইউরোপের বাজারে বিক্রী হোত। ওদেরই সাংঘাতিক লোভে পরবর্তীকালে এসে জোটে ড্যানিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা। অবশেষে সবাইকে তাড়িয়ে মহামতি ইংরেজ বণিকরা এসে জাঁকিয়ে বসে। তারপরে যা হয়। 'বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্বরী, দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে।'

রামায়ণের রাজা রামচন্দ্র বা দশশির রাক্ষসরাজ রাবণের কোনও বাস্তব চিহ্ন নেই আধুনিক সিংহলে, ওগুলো আছে ভারতীয় গল্পে বা মহাকাব্যে। কিন্তু আজও যেটি রয়েছে অক্ষত ও অব্যাহত হয়ে, সেটি পুরাণ বর্ণিত স্বর্ণলঙ্কা। জলে, স্থলে ও মৃত্তিকার গর্ভে যে প্রাকৃতিক সম্পদের অতি প্রাচুর্য এই ক্ষুদ্র ভূভাগটিতে চোখে পড়ে, তার তুলনা মেলা ভার।

একই ছবি চলছে পশ্চিম সমুদ্রতীরবর্তী নেগম্বো থেকে আরম্ভ করে সুদূর দক্ষিণে 'জাতরা' পর্যন্ত। তারপর আরম্ভ হোল দক্ষিণ-রুহন্ থেকে গল্ওইয়া। সেই একই ছবি—শোভা ও সমৃদ্ধির। এরপর পূর্বসমুদ্রের তীরে সেই ইউরোপ-প্রসিদ্ধ বন্দর-জনপদ 'বাত্তিকালোয়া'—যার সুদূর বিস্তৃত ও চক্রাকার সোনালী বালুবেলা

নারিকেল কুঞ্জের ছায়ার স্বষ্টি করে রয়েছে দিগ্‌দিগন্ত জোড়া এক মায়ালোক। নরনারীর পক্ষে মধুযামিনী যাপনের এমন প্রশান্ত স্বপ্নজগৎ এখন ভারতবর্ষেও সহসা চোখে পড়ে না। না, ভুলিনি কাশ্মীরের সোনামার্গের পাশ কাটিয়ে সেই বলতালের নিভৃতলোক, যেখানে স্বর্গত জওহরলাল নেহরু শ্রীমতী কমলার সঙ্গে একদা মধু-যামিনী যাপন করেছিলেন। তবে সেখানে বড় ঠাণ্ডা, সেখানে বসন্ত সমীরণ বলে কিছু নেই। 'সমগ্র সিংহলে অগণিত সংখ্যক মধুযামিনী যাপনের ক্ষেত্রের মধ্যে কালকুদাহ, পাশিকুদাহ, আরুগাঁও সৈকত পুলিন, বাত্তিকালোয়া—এগুলি খুবই আনন্দদায়ক। এই বাত্তি-কালোয়াতেই ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিকের দল সমুদ্রতীরে অবতরণ করে। এই জনপদের একটি সুবিধা এই, এখানকার সমুদ্র এখানে একটি অগভীর জলভাগ (Laggon) রচনা করেছে।

জীবনে অনেক প্রকার কৌতুক রঙ্গ দেখেছি। কিন্তু ঘন-জ্যোৎস্নার রাত্রে এই লেগুনের জলের মধ্যে নানা রঙে রঙ্গীন সমুদ্র মৎসরা যে গান গায় এবং সঙ্গীতালাপ করে, এ কৌতুক নতুন বৈকি! এটি শোনাও সহজ।

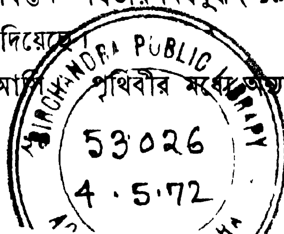
টেলিগ্রাফ পোষ্টের গায়ে কেউ যদি কখনও কান পেতে ভিতর থেকে আওয়াজ শুনে থাকে, সে বুঝবে কি বলছি। জ্যোৎস্না রাত্রে যদি কেউ এই লেগুনের জলে একটি লাঠি চুবিয়ে রেখে তার ওপর কান পেতে থাকে, সে শুনবে এই সঙ্গীত। মনে পড়ে যাচ্ছে অন্য এক কনসার্টের কথা। ইউরোপের বহু শহরে বহু রকমের কনসার্ট বাদ্য শুনেছি, কিন্তু আজমেরের পুষ্করতীর্থের ওপ্রারে 'সাবিত্রী পাহাড়ে'র চূড়ার কাছাকাছি এক ঝোপ-ঝাপড়ার পাশে একখানা পাথরের উপর বসে এই কিছুকাল আগে যে কনসার্ট শুনেছি, তা অবিস্মরণীয়। কিন্তু সে কনসার্ট মানুষের বাদ্য নয়। এখানে যেমন মাছের কনসার্ট, সেখানে তেমনি পতঙ্গের। তার মাত্রা, ছন্দ,

ঐকতান, তার বাদ্য ও ক্ষণবিরতি—এগুলি বিভিন্ন কণ্ঠে, স্বরে, লয়ে এবং সঙ্গতের দ্বারা পরিচালিত করছিল মাত্র ১০।১৫টি পতঙ্গ। শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে ঝিঁঝিঁ পোকা ও ব্যাঙেরা এই ধরণের ঐকতানে মত্ত হয়ে ওঠে।

বাত্তিকালোয়া থেকে দুটি প্রধান পথ গেছে উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে। উত্তরে সমুদ্রতীর ধরে একটি পথ গিয়েছে ত্রিন্‌কোমালি এবং অন্যটি পোলন্নারুয়া, সিরিগিয়া ও দামবুল্লা হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে কলম্বোর দিকে চলে গেছে।

পূর্বসাগরকে এখানে বলা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর, কিন্তু নিশানা তার কিছু নেই। অগাধ ও অনন্ত সমুদ্রে কোথায় মিলছে উপসাগর এবং মহাসাগর—তার জরীপ কে কবে করে গেছে কে জানে? শুধু আছে মহাকাশের নীচে লঙ্গিচিউড ও ল্যাটিচিউড মাত্র। তা হবে। কিন্তু আমার জাতীয়তাবাদী মন সুদূর সিংহলের পূর্বসমুদ্র প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঈষৎ পুলকিত হয়, যখন শুনি এটির নাম বঙ্গোপসাগর ও ওটির নাম ভারত মহাসাগর! এইতো মাত্র আমাদের তরুণ বয়েসের কাল মনে পড়ছে। বৃটিশ ভারত সাম্রাজ্যের মানচিত্র রচনায় ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয় উপদ্বীপ ও সিঙ্গাপুর এঁকে ইস্কুলে দেখাতে হোত। সেই মানচিত্র অঙ্কনে দেখতে পাওয়া যেত কাশ্মীরের উত্তরে পামীরের অংশ ও সিংকিয়াংয়ের সীমানা, সমগ্র কারাকোরাম ও লাদাখ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শেষে বালুচিস্তান ও আফগান সীমান্ত 'ডুরাণ্ড লাইন' অবধি। সেদিনকার সেই 'মহাভারত' এখন শুধু ভারতে পরিণত। ওরা অনেকে চলে গিয়েছে একে একে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করে। সেই অধিকার একে একে দিয়ে গেছে ইংরেজ তার যাবার আগে পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

আবার পৃথিবীর কথায় আসি। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ



বন্দর হোল ত্রিন্‌কোমালি। এ বন্দর কলম্বোর মত খোলা সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, কিন্তু এখানে স্থলভাগের বাইরে চক্রাকার একটি উপসাগর রচিত হয়ে আছে। যেমনটি দেখছি দ্বারকা ছাড়িয়ে ভেট-দ্বারকার ওখা বন্দর, সেখানে এককালে করাচীর জাহাজে উঠেছিলুম করাচী ও বোম্বাইয়ের মাঝখানে পড়ত ওখা। ত্রিন্‌কোমালির উপসাগর অনেক বৃহৎ, অনেক বেশি সুন্দর ও মনোরম। ত্রিন্‌কোমালি সব মিলিয়ে যেন এক মহাকাব্য। এখানে আধুনিক কালের সব রকমের জাহাজ ঘাটা রয়েছে, এবং নিরাপদ নোঙর করার পক্ষে সব রকমের সুবিধা। তাল ও নারিকেলের অনন্ত বনময়তা ত্রিন্‌কো-মালিকে যেন নিত্য ছায়াচ্ছন্ন করে রাখে। লেগুনের চারিদিকে বনবীথিকার পাশে পাশে সমুদ্রের তীরে স্বর্ণ-সৈকতের উপর দিয়ে উতলা বসন্তের বাতাস যখন ফুরফুরিয়ে বয়ে যেতে থাকে, তখন যেন পেয়ে বসে মহাকবির ভাষায় যাকে বলে, 'অনাদিকালের বিরহ-বেদনা'। এত অজস্র রঙ্গীন পাখি—যাদের নামও জানিনে—কোথায় দেখা যায়? এত ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেতবর্ণ সী-গল্ আর কোন দেশে পাওয়া যায়? এত সমুদ্রস্নান ও রঙ্গীন ঝিনুক সংগ্রহ আর কোথায় হয়? অরণ্য সমাকীর্ণ অঞ্চলে বৃহদাকার ও স্বচ্ছ জলাশয় আর কোথায় চোখে পড়ে?

ত্রিন্‌কোমালির উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ কিছু পার্বত্য-অরণ্যে আকীর্ণ। অরণ্য নীল, মহাকাশ নীল, সমুদ্র নীল এবং তীরভূমি সুবর্ণ রেখাঙ্কিত। ওরই মধ্যে পাহাড়টির নাম 'স্বামী-পাহাড়।' আছে তারই মধ্যে 'কানিয়াই' নামক একটি ধাতব-উষ্ণ জলের ঝরণা, আছে 'কান্তালাই' নামক সরোবর। তারপর যতদূর চেয়ে থাকো আখের চাষ-আবাদ। নৌকা নিয়ে লেগুনের মধ্যে ভেসে যাও, জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়াও, বড় বড় মাছ শিকারে বেরিয়ে পড়,—এবং আরও অনেক আছে আকর্ষণ!

'স্বামী-পাহাড়ে'র নিম্নভূভাগে যেখানে পাহাড়তলী নেমে এসেছে সমুদ্রের খাঁড়িতে, সেখানে এক প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে জলের মধ্যে, যেমনটি দেখতে পাওয়া যায় বারাণসীর মণিকর্ণিকায়। হাতীর মুণ্ড দাঁড়িয়ে আছে এখানে—মন্দিরের প্রতীক চিহ্ন, ভারতের ঐশ্বর্যের প্রতীক। এখানে সারা দিনমান কাটানো চলে শুধু বড় রঙ্গীন সামুদ্রিক মাছের খেলা দেখে। এখনও ছোট বড় দুই একটি মন্দির ওই পাহাড়েরই কোলে দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলি দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্য রীতিকে পৃথক করে তোলে। উপর দিকে বহুকাল আগে যে বিরাট হিন্দু মন্দিরটি সহস্র স্তম্ভের উপরে একদা দাঁড়িয়েছিল, তার নির্মাণকাল এখন আর জানা যায় না। কিন্তু সেই সুবৃহৎ মন্দিরটি ধ্বংস করে পর্তুগীজ বণিকরা ১৬২২ খৃষ্টাব্দে। এই একই কালে পর্তুগীজরা পশ্চিম ভারতে ও বাঙ্গলায় তাদের ছোট ছোট উপনিবেশ গড়ে তোলে। দক্ষিণ বাঙ্গলায়, সুন্দরবনাঞ্চলে এবং ২৪ পরগণায় এককালে ওদের উৎপাত কম ছিল না। 'টালীর নালা'—যেটিকে বলা হয় আদি-গঙ্গার ধারা, সেটি ওদেরই সৃষ্টি এবং ওরাই আদি-গঙ্গার ধারাকে দক্ষিণ পথ থেকে ঘুরিয়ে গড়িয়ার খাল হিসাবে পূর্ব দিকে নিয়ে যায়। এককালে ওরা ২৪ পরগণায় আড়কাটির সাহায্যে বাঙ্গালী মেয়ে ধরে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে সোজা নিয়ে যেত আরাকানে। যতদূর জানি, এটাকেই তৎকালে বলা হোত 'মগের মুলুক।' ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে আমি দেখেছি সেই তাদের বংশ পরম্পরা, যারা আজও বাঙ্গালীর চেহারা বহন করে এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় কথা বলে। সমুদ্রে 'শামপান' চালিয়ে তারা মাছ ধরে, ভাত খায়, লুঙ্গি বা ধুতি পরে, বাঙ্গালীদের মতই ঘরদোর বা কাঁচাবাড়ি বানায়। ওরা পর্তুগীজদের সংমিশ্রিত জাতি। বরিশাল জেলার নদী-নালার আশেপাশে—আঁধার-মানিক বা গর্জনবুনিয়ার তটে তটে—পুরনো জামদারের অনেকে এখনও

পতু গীজ পদবী ধারণ করে আছে।

সমগ্র সিংহলে মোট ১৬টি উল্লেখযোগ্য নদী। তাদের মধ্যে ৬টির সঙ্গে 'গঙ্গা' শব্দটির যোগ আছে। যেমন মহাবলী-গঙ্গা, কেলানী-গঙ্গা, মানিক-গঙ্গা, জিন-গঙ্গা প্রভৃতি। জলধারাপথ বা স্রোতস্বিনীকে বলা হয়, 'ওইয়া'। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘধারা মহাবলী-গঙ্গার দৈর্ঘ্য হোল ২০৬ মাইল, এবং সর্বাপেক্ষা ছোট নদী গল-ওইয়ার ধারাপথের দৈর্ঘ্য ৬২ মাইল।

'গল-ওইয়ার' উপত্যকা-পথ আমাকে হিমাচল প্রদেশের 'বাসপা' উপত্যকার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। সিংহলে সিংহ কোথাও নেই, কিন্তু 'সিংহরাজ' অরণ্যানী বর্তমান। এমন এমন মনোরম ভূভাগ আছে সিংহলের বনময় পার্বত্য অঞ্চলে, যাদের অপূর্ব শোভা এবং স্নিগ্ধশ্রী চিরদিনই মনোমুগ্ধকর—যার জন্য ইংরেজ এই দ্বীপ-রাষ্ট্র থেকে সহজে নড়তে চায়নি। গল-ওয়াই, লাহুগালা, সিংহরাজ, নিউওয়ারায়েলিয়া, পোলন্নারুয়া—এসব অঞ্চলে বন্য হস্তীর সংখ্যা প্রচুর। সাপ, বাঘ, হরিণ, বানর, বায়সন,—সব রকমের জন্তু জানোয়ার সর্বত্র ছড়ানো। মোটরলঞ্চে চড়ে 'সেনানায়েকে সমুদ্র' নামক সুবৃহৎ জলাশয়ের ওপারে গেলে মনে হয় যেন আদিম এক মহারণ্যে পা ফেলে গা ছমছম করছে। নিস্তব্ধ বিশাল বন। নাম 'মাকারা।' তারপর স্বচ্ছ-শ্রী জলাশয় একটির পর একটি,—কত গুনবো? ওখানে আছে বৃহৎ আয়ের চাষ, তার সঙ্গে আছে আবার মদের ভাটিখানা।

কিন্তু 'মাকারা' অরণ্যে পৌঁছবার আগে 'সেনানায়কের সমুদ্র' প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য। সিংহলে অগণিত সংখ্যক বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে একটি অন্যতম—৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর ভূভাগ নিয়ে এই জলাশয়ের পত্তন করেছে একদল আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার। এ জলাশয় দেশের সমৃদ্ধির একটি মস্ত উপকরণ। সিংহলে দুর্ভিক্ষ

ঘটেছে কখনো শোনা যায় না। বৃষ্টির অভাবে ফলনের হানি ঘটেছে, এ সংবাদও কম। কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎকালে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে একটা বড় রকমের বেকার সমস্যা এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক প্রকার অসন্তোষ ধূমায়িত হতে পারে। এটি জেনেছিলুম 'মাতেল' নগরীতে।

বনজঙ্গলের কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলুম। নতুন দেশ-ভ্রমণের কালে বনজঙ্গল একটু আধটু না ঘুরে গেলে মনে হয় যেন ভ্রমণটা কিছু অসম্পুর্ণ রয়ে গেল।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল বনজঙ্গলেই শিকারীরা জন্তু-জানোয়াদের খুঁচিয়ে বেড়ায়, সুবিধা পেলেই হত্যা করে। এর এলে জন্তুরা একদিকে যেমন ভয়কাতর, অন্যদিকে তেমনি প্রতিরোধস্পৃহা-পরায়ণ। হিংস্র জন্তু অধিকতর হিংস্র হয়ে ওঠে মার খেয়ে। বনের বাঘ আজও মানুষের ভয়ে অস্থির হয়ে গা ঢাকা দেয়, যদি সে নরখাদক না হয়। সাপ ভয় না পেলে কামড়ায় না। রাজশাহী ও পাবনা জেলার সীমানায় কাছিকাটা গ্রামে ছিলুম বহু দিন। বড় বড় গোখরো-কেউটে পায়ের পাশ দিয়ে ঘরের কানাচে সকাল সন্ধ্যায় উঠে আসত। পাবনার চরতারাপুরের ধারে সুজানগরের একটি বাড়িতে ছিলুম মোট মাস দুই। সে বাড়ির কাঠের বা খড়ির ঘরে, দরজার খিলের পাশে, উঠোনের মাচায়, পায়খানার মধ্যে, ঘরের মধ্যে, ঘরের পাশে নীলকুঠির ঢিবিতে কেউটে, গোখরো, বেত-আঁচড়া, শঙ্খিনী লাউডগা প্রভৃতি অসংখ্য বিষাক্ত সাপ ছিল, যারা রাত্রের দিকে শোবার ঘরের মধ্যে ঘুরে যেত,—কই, কোনটাই তো কামড়ায়নি! নাটোরের রাজবাড়ীর সামনে যে পরিখার ধারে ঘুরেছি কতদিন, যার জলের মধ্যে ও পাড়ের ধারে অন্তত দু হাজার সাপ সাঁতার কাটত আর ডাঙ্গার ধারে চলে ফিরে বেড়াত প্রত্যহ দিনে-রাত্রে, তারা তো কই অনিষ্ট করেনি!

আবার ওইতো সেবার দেখে এলুম দণ্ডকারণ্যের সীমানায় 'বন্দা' পাহাড়ের ধারে ধারে, জীপ গাড়িতে আসবার কালে এক অপরাহ্ণে একটি বাঘ লাফিয়ে এসে বসল গাড়ির সামনে। সেই গাড়ির মহিলা দুটির একটি চেকোস্লোভাক, অন্যটি রাশিয়ান। উভয়েই অধ্যাপিকা। ওঁরা গিয়েছিলেন বান্দা পাহাড়ের উপরে দণ্ডকারণ্যের আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা দেখার জন্য, যাদের মেয়েরা একটি সংস্কার রক্ষার জন্য আজও উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়! যাই হোক, তাঁদের পথের উপর থেকে সেই সমস্ত বাঘও নড়ে না এবং ওঁরাও জীপের হর্ণ দেওয়া থামান না। সেই নাটকীয় সঙ্কটকালে ক্যামেরা নিয়ে হঠাৎ গাড়ি থেকে নামলেন সেই সোভিয়েট মহিলা, কড়াং করে তিনি সেই বাঘের ছবি তুলে নিলেন। বোধকরি সেই আনন্দেই বাঘটি এক লাফে পাহাড়ের পথ ছেড়ে নিচের দিকে নেমে চলে গেল।

আমি ছিলুম সেই বন্দা পাহাড়ের তলার একটি ঘরে আশ্রিত।

যাইহোক, সিংহলের ন্যাশন্যাল পার্কগুলিতে প্রবেশ করার আগে ভারতীয় হিংসা বা হিংস্রতা পিছনে ফেলে আসাই ভাল। ভারতে নানা মতবাদের নানান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংস্রতা আছে প্রচুর। বন্দুক ছাড়া বন-জঙ্গল তারা ভাবে না। সিংহলীরা স্বভাবতই বন-জঙ্গলে শিকারের কথা ভাবে না, তারা কেবল অরণ্যচারণ করেই আনন্দ পেয়ে থাকে। অমন যে ইংরেজ, যারা সিংহলকে গ্রাস করেছিল দেড়শ বছর ধরে, তারাও এখানে অনেকটা বৌদ্ধ প্রভাবে পড়ে গিয়েছিল। তারাও কথায়-কথায় বন্দুক নিয়ে বন-জঙ্গলে ঢোকে না।

সিংহলে যতগুলি ঘন বন-জঙ্গলের এলাকা আছে তাদের অধিকাংশই দক্ষিণ ও পূর্ব সমুদ্রের বালুবেলার সীমানায়। আমাদের যেমন সুন্দরবন। তফাৎ এই, সিংহলের জনবিরলতা। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের পক্ষে কোথাও কোনও দিকে ভয় নেই, তারা অবাধ

ও স্বচ্ছন্দবিহারী। তাদের নিজের জগতে তারা থাকে নির্ভাবনায়। মানুষকে আক্রমণ করার কথা তাদের মনে আসে না, বিষধর সাপ কথায় কথায় ফনা তোলে না, এবং জিম কর্বেট বর্ণিত রুদ্রপ্রয়াগের লেপার্ডের মত কোনও বাঘ মানুষ মারার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে না!

ফলে, সিংহলবাসীদের মত সিংহলের অরণ্যগুলিও বৌদ্ধ প্রভাব-গ্রস্ত। বুদ্ধের অহিংসবাদ অরণ্যে-অরণ্যে প্রচলিত রয়েছে দুই হাজার বছরেও বেশি, এবং সব বন-জঙ্গলই গভর্ণমেণ্টের খাস। জঙ্গলে যেতে গেলে সরকারি পারমিট লাগে, এবং বন্দুক সঙ্গে থাকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গাড়ি নিয়ে যেতে হয় বনভূমির মধ্যে। চারিদিকে অরণ্যের আদিম চেহারা চোখে পড়ে। সেখানে কাঠুরিয়ারা কেউ ঢোকে না। ঠিক যেমনটি একদা দেখেছিলুম কাস্পিয়ান সমুদ্রের ধারে ককেসাস পাহাড়ের তলায় তলায় এবং দক্ষিণ জার্মানীর বাভারিয়ার অরণ্যের ভিতরে ভিতরে—যার মাথরে উপরে আল্‌পস ও নিচের দিকে ব্ল্যাক-ফরেষ্ট। সেখানে শুধু বিপুল পাইন বনের শোভা।

তিনটি প্রধান ন্যাশন্যাল পার্ক রয়েছে সিংহলে। রুহুনা, উইলপত্তু ও গল-ওইয়া। তিনটিই ঘন অরণ্য। এর মধ্যে রুহুনা হোল বৃহত্তম, যার আয়তন ১২২ বর্গমাইলের বেশি। রুহুনা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং পর্যটক মাত্রেরই একটি প্রধান আকর্ষণ। এ অঞ্চলটি দক্ষিণ-পূর্ব সিংহলে,—এটিতে পৌছতে গেলে লেগুনের ভিতর দিয়ে কালিয়াড়ি পার হয়ে ময়দান অতিক্রম করে এবং জলাশয়ের পথ ঘুরে আসতে হয়। চারিদিকের জনশূন্যতার মধ্যে এই অরণ্যলোক যেন মানুষের সর্বপ্রকার লোভের বাইরে এক আশ্চর্য জগৎ। পর্যটকের গাড়ির পাশ দিয়ে বৃহদাকার বলিষ্ঠ হাতীর দল চলে যায় আপন মনে, হরিণের পাল অদূরে কৌতুহলী হয়ে থমকিয়ে দাঁড়ায় নির্ভয়ে, চিতাবাঘ কাছাকাছি এসে শান্ত হয়ে বসে, শম্বর নিজের মনে ঘাসপাতা খেয়ে যায়, 'কাকার হরিণ' মাথা তুলে চেয়ে থাকে।

অতি প্রত্যূষে এবং গোধূলি কালে এদের আবার বিচরণ দেখার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। অরণ্যের ভিতরে এসে দাঁড়ালে সামনে যেন এক বিশাল পাখি-সমাজ, যাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। রঙ্গীন সারস, শ্বেতবর্ণ হরিণ, রক্তিম চক্ষু ধনেশ পাখি, বুলবুলি ও পাপিয়ার ঝাঁক, কাঠঠোকরার অবিশ্রান্ত ডাক, আরও অগণ্য বর্ণাঢ্য পাখি। রঙ্গীন ঘুঘু, নীলকণ্ঠ, হরিয়াল, চক্রবাক, চিরপরিচিত কোকিল, সবাই বাসা বেঁধে থাকে এই আদিম অরণ্যে।

'বিরবিলা' আরেকটি অরণ্য, কিন্তু এটি জলাশয় প্রধান। বনহংস দলের এটি অবারিত বিচরণক্ষেত্র। চারিদিকে অরণ্যপক্ষীরা এদিকে স্থায়ী আশ্রয় নিয়ে থাকে। ওদের কারও নাম ওরিওল, বার্বেট ও হর্ণবিল। পাখিরা নিজেরা জানে না তাদের নাম, মানুষ শুধু একেকটা সংজ্ঞা দিয়ে রেখেছে মাত্র। এর পর আছে অন্যান্য বনজঙ্গল—যাদের নাম 'ইয়ালা' আর 'কুমানা', আর আছে 'লাহুগালা' আর 'কিটুলানা'। সর্বশেষে আছে 'মিহিনটেল।'

'মিহিনটেল'—নামটি শুনে থমকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। এটি দেশভেদে উচ্চারণের বিকৃতি। মূল শব্দটি হোল 'মহেন্দ্রতাল।' 'তাল' শব্দের অর্থ জলাশয়। যেমন নৈনীতাল, ভীমতাল, শ্যামলাতাল ইত্যাদি। এই 'মিহিনটেলের' তীরে দাঁড়িয়ে পুরাকালে রাজা দেবনামপিয়তিস্‌স বৌদ্ধদর্শনের পবিত্র বাণী শিরোধার্য করেছিলেন। সেই রাজভিক্ষুর অনুজ্ঞাক্রমে দেশের সর্বত্র জীবহত্যা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে আজ দুহাজার বছরেরও বেশি হোল এই 'মিহিনটেল' একটি মহাতীর্থ-পূজার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

নিজদেশের অরণ্যভূমির সম্বন্ধে সিংহলীরা বেশ একটি ভালো কথা বলে। তারা বলে আফ্রিকার বৃহৎ বনভূমি, ভারতের বৃহৎ অরণ্যানী বা দক্ষিণ আমেরিকার অন্তহীন বন্য-প্রকৃতি হয়তো অতিশয়

সম্পদশালী—কিন্তু আমাদের বনে অরণ্যে, সমুদ্রতীরে, বৃহৎ জলাশয়ের আশেপাশে বনচারী শ্বাপদরা মানুষকে যেমন বিশ্বাস করে, কাছে এসে দাঁড়ায়, পাশ কাটিয়ে আপন মনে চলে যায়, এ দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি ?

সিংহল-প্রকৃতি এই অহিংসবাদকে চিরকালের জন্য গ্রহণ করেছে।

॥ তিন ॥

এবার যাচ্ছি প্রকৃত তীর্থদর্শনে। আবার সেই উত্তরাপথে যাত্রা। পথ আমাদের সোজা। কলম্বো ছেড়ে রাজপথ উত্তর দিকে যাচ্ছে দূর-দূরান্তরে। মাদ্রাজ নগরে যেমন মাউণ্ট রোড—প্রারম্ভে সুন্দর ও জনবিরল, শেষের দিকেও তাই, অনেকটা একই চেহারা। মধ্যাংশটা বিশাল জনবহুল আধুনিক শহর! কলম্বোর জনবহুলতা ধীরে ধীরে কমে আসে এক সময়ে।

বন বাগান এবং নারকেল কুঞ্জের শোভা দেখতে দেখতে চলেছি। একটির পর একটি অভিজাত পল্লী চোখে পড়ছে। সম্পদশ্রী লক্ষ্য করে যাচ্ছি। বড় কোনও শিল্পনগরী চোখে পড়ছে না, যেমন দুর্গাপুর, বার্ণপুর, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদি। শ্রমিক আন্দোলন বা অশান্তির খবর পাচ্ছিনে। হাতুড়ি-কাস্তের ছবি লক্ষ্যে আসছে না। একটি মিছিলও এ পর্যন্ত দেখিনি।

আড়াই হাজার বছর ধরে সিংহলী প্রকৃতির মধ্যে যাঁতা হয়ে বসেছে বৌদ্ধনীতি। মন এদের স্বভাবতই হিংসাশ্রয়ী নয়। পার্লামেণ্টারী রাজনীতি আছে বিদ্বেষ আছে পারস্পরিক, কিন্তু ইতরতা বোধ এখনও কম। দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা ইদানীং আর কানে আসছে না। যেখানে সেখানে আলাপ করে বুঝতে পারা যায় ভারতকে এরা মনে মনে ভয় করে। ভয় মানে যে শ্রদ্ধার অভাব, এটা ওরা জানে বৈকি। ভারত সর্বাপেক্ষা নিকট, তাই ওদের ভয়। দাক্ষিণাত্যের হাতে ওরা মার খেয়ে এসেছে বহু শতাব্দী ধরে, তাই ভারতকে ওদের ভয়! ভারতের জনবল, ধনবল, অস্ত্রবল, সংগ্রাম পটুতা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব,—এগুলি ওদের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ-

জনক নয়। সেইজন্য ভারতের যারা বৈরী শক্তি, যেমন চীন ও পাকিস্তান—তাদের সঙ্গে ওদের বন্ধুত্বের বোঝাপড়া থেকেই যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গে যে দেশব্যাপী গণহত্যা চলছে, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর চাপে ভারতবর্ষ যে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলছে সমস্ত জগতের সামনে—এতে সিংহলে ভ্রুক্ষেপমাত্র নেই! ভারত-চীন বিরোধের কালে সিংহল একটি অঙ্গুলি হেলনও করেনি। সে নিষ্ক্রিয়, নিরাসক্ত ও নির্বিকার। ভারতের কাছে সাহায্য চাইতে তার যেমন কুণ্ঠা, তেমনি ভারতের কোনও প্রয়োজনে সাহায্য দিতেও তার মন নারাজ। সে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস করে না যে, ভারত তাকে ভালবাসে। কারণ দাক্ষিণাত্যের প্রতি সে চিরকাল সন্দিগ্ধ। কেরালা ও তামিলনাড়ুর প্রতি ওরা কোন কালেই প্রসন্ন নয়। পাছে পাকিস্তান মর্মাহত হয় এজন্য পূর্ববঙ্গবাসীর প্রতি একটিও সহানুভূতির বাক্য ওরা অদ্যাবধি উচ্চারণ করেনি। অনন্ত ও অপার করুণায় গৌতম বুদ্ধের হৃদয় বিগলিত ছিল, কিন্তু বাঙ্গলা দেশের প্রায় দশ লক্ষ নরনারীর শোচনীয় অপঘাত মৃত্যু এবং লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগীর দুঃখ দুর্গতিতে বৌদ্ধ-সিংহলের একবিন্দু করুণারও আভাস পাওয়া গেল না।

গ্রামের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর ছুটছিল। রৌদ্রের প্রখরতা ছিল, কিন্তু বসন্তের মধুর স্নিগ্ধ বাতাস ছিল আনন্দদায়ক। এদিকটায় প্রতি নারকেল গাছে ফলন দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু নারকেলগুলি যেমন এক একটি গিনি সোনার পিণ্ড! এমন স্বর্ণাভ নারকেল আগে দেখিনি, এবং এ ছবি ভারতের কোথাও নেই। এর নাম 'কিং কোকোনাট'। প্রত্যেকটির দাম বাঁধা, অর্থাৎ ৮০ সেণ্ট ওরফে ৮০ নয়া পয়সা। একটি নারকেলে দু গেলাস জল। সাইজ বড় নয়, কিন্তু ভিতরের খোল অনেক বড়। এর জল পান করলে অপরিসীম তৃপ্তি। সব দেশের কচি ডাবের জলে নুনের একটা সূক্ষ্ম ভাগ থাকে। সেইজন্য কলেরা রোগীর পক্ষে ডাবের জলের ইঞ্জেকশন

কাজে লাগে। 'কিং কোকোনাটের' বন যেন স্বর্ণলঙ্কারই প্রতীক।

এ যাত্রায় সঙ্গে ছিলেন অপর একজন টুরিষ্ট। ইনি লুধিয়ানা-জলন্ধর অঞ্চলের জনৈক স্থূলাঙ্গ পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী। নাম মিঃ আগরওয়ালা। তিনিও 'কিং কোকোনাটের' জল পেট ভরে ফেলেন। কিন্তু যখন শুনলেন, এটি কলেরার প্রতিষেধক স্বরূপ, তখন বললেন, অওর দো দেও!

আরও দুটো! একটু অবাক হলুম, কিন্তু চুপ করে রইলুম। তাঁর কিডনির প্রক্রিয়ার জন্য এর মধ্যে বার তিনেক গাড়ি থামাতে হয়েছে। যাই হোক, ভদ্রলোক কথায়-কথায় জানালেন, এই নিয়ে তিনি সিংহলে এলেন চতুর্থবার এবং জানালেন এবার তিনি লঙ্কার রাজা রাবণের মন্দির বা কীর্তিচিহ্ন দেখবেন। রাজা রাবণের প্রাত ওঁর মোহ যেন ওঁর চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল।

এর আগে তিনবার তিনি এদেশে রাজা রাবণের খোঁজ করেছিলেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, তিনি 'বেওপারী আদমি', তাঁর হাতে সময় ছিল কম। তাঁর কাজ-কারবার সম্বন্ধে ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলতেই তিনি জানালেন, কপ্‌ড়ে চোপ্‌ড়েকে। কথায় কথায় তিনি তাঁর. পাসসোর্ট বার করে দেখালেন, মোট বাইশ-বার তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়েছিলেন। যখন প্রশ্ন করলুম কেমন দেখলেন সে সব দেশ? তিনি ঢেঁকুর তুলে বললেন, ম্যায় তো কারবারি আদমি হুঁ, উধার কামানে যাতা—। তবে কি জানেন, ওসব মুলুকের লোক তেমন 'সেয়ানা' নয়। হমলোকসে ডরতা হ্যায়!

ইউরোপ বা আমেরিকা ওঁর মতন লোককে ডরায়—এটি শুনতে বেশ লাগল। তারপর উনি বেশ ধীরে-সুস্থে আন্তর্জাতিক বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের কৌশলাদি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। এদেশে নাকি ভারতীয় মুদ্রার দাম বেশি এবং ষ্টার্লিং পাউণ্ড সহজ লভ্য। তিনি মুখে মারজিন কষে আমাকে জানিয়ে দিলেন, তিনি

এখানে দিন পনের এখনও থাকবেন, কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যে তিনি যদি চার পাঁচশ পাউণ্ড রোজগার করে না যান তবে তাঁর আসাই তো মিথ্যে !

কেমন করে করবেন ?

আগরওয়ালা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। পরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, যারা লেখাপড়া নিয়ে থাকে তাদের হিসেব বুঝি কম। এই ধরুন, আপনি দেখছেন আমার দুখানা হাত। কিন্তু আপনার পক্ষে এটা চোখের ভুল। রাবণের দশ মুণ্ড ছিল, মানে কুড়িখানা হাত। বিশঠো হাতকা বিশঠো কাম! এককো সাথ দুসরেকো মিল নহি ! এবারে বুঝতে পেরেছেন ?

না।

আগরওয়ালা হেসে শুধু বললেন, প্রথমবার সবাই আপনার মতন বুদ্ধু থাকে, দ্বিতীয়বারে 'সেয়ানা বন্ যাতে—।'

আমার জ্ঞানচক্ষু তিনি যেন খুলে দিচ্ছিলেন। আমার চক্ষে যেন প্রতিভাত হচ্ছিল কেন তিনি বাইশ বার বিদেশে গিয়েছিলেন।

কল্যাণী-গঙ্গা পার হয়ে গেলুম। নদীটি সরু, বাঙ্গলার দামোদরের মত। ছোট বড় 'গঙ্গা' সিংহলে অনেকগুলি, এবং গঙ্গা মানেই পবিত্র। মৌর্যসম্রাট অশোকের অন্যতম প্রধান রাজধানী ছিল পাটলি-পুত্র—গঙ্গাতীরবর্তী। সেই গঙ্গার ঐতিহ্য এরা এখানে বহন করে। যেমন জিন-গঙ্গা, নীলবালা-গঙ্গা, কালু-গঙ্গা, ওয়ালাওয়ে-গঙ্গা, মহাবলী-গঙ্গা, মানিক-গঙ্গা ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চল একটির পর একটি পার হচ্ছি। কথায় কথায় চোখের সামনে এক একটি বৃহদাকার স্বচ্ছ সরোবর। মাঝে মাঝে তার আয়তন ২০।২৫ বর্গমাইল হতে পারে। মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে 'আরক ট্র্যাভার্ন' অর্থাৎ দেশী মদের দোকান। কোথাও কোথাও বিশ্রাম-নিবাস, কোথাও বা মনোজ্ঞ ব্যবস্থাযুক্ত খাবার হোটেল। বাঙ্গালী রসনার উপযুক্ত খাদ্য মিলতে দেরি হয়

না। আজ ছুটির দিন। অর্থাৎ 'পোয়য়া ডে।' সিংহলী পাঁজি অনুসারে চন্দ্রমাসে পাঁচটি বা ছয়টি 'পোয়য়া ডে।' এদিন সব আপিস ছুটি, সব কাজ বন্ধ। মদ্যের চলন সিংহলে অবারিত। বিলেতী মদ খুবই সুলভ। সামাজিকতায় মদের চলন যথেষ্ট।

সকাল নটায় কলম্বো ছেড়েছি, থেমে থেমে আসার জন্য প্রায় সাত ঘণ্টা লাগল ১২৫ মাইল পেরিয়ে অনুরাধাপুরায় পৌঁছতে। সিংহলের ঠিক হৃৎকেন্দ্রটিতে অনুরাধাপুরা। এদেশের সর্বাপেক্ষা পবিত্র নগরী অনুরাধাপুরা এবং এই নগরী সিংহলের প্রথম প্রাচীন রাজধানী। কিন্তু এই প্রাচীন নগরীটির পাশেই আধুনিক অনুরাধাপুরা নির্মাণ করা হয়েছে গত বিশ বছরে। সুতরাং নূতন নগরে পৌঁছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবাসিক হোটেলের দরজায় এসে আমাদের গাড়ি দাঁড়াল।

আধুনিক হোটেল—যথাসম্ভব আধুনিক। কলিং বেল, কাঁচের দরজা, কাউচ ভরা লাউঞ্জ, ভাল কাউণ্টার, রিসেপশন কর্ণার, পোষাক পরা ভৃত্য; দুচারটি সাহেব-মেম—সর্বত্র ছিমছাম। আমাদের ড্রাইভারের চুল পাকা, রং কালো, পরণে সাদা শার্ট ও প্যাণ্ট, এবং ভাল ইংরেজি জানা সিংহলী। রিসেপশনে গিয়ে তিনি কী যেন বললেন, ফলে আমার জন্য বাগানের ধারে একটি সুন্দর ডবল-বেডযুক্ত ঘর নির্দিষ্ট করা হল। ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার। ঘরের ভিতরে ধবধবে বিছানা, নতুন টেবিল-চেয়ার, নতুন দুটি মশারি, এবং বাড়িটির মত সবই নতুন। ঘরের সামনেই লন, অদূরে ফল-ফুলের বাগান, কলার কাঁদি ও পেঁপে ঝুলছে। লাল গোলাপ ফুটে আছে, তার পাশে সূর্যমুখী, ওদিকে নীলবর্ণ অপরাজিতা। মাঝে মাঝে মৌশুমী ফুলের চারা। বোধহয় কোন সময় হালকা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে থাকবে, গাছে পাতায় জলের দানা অপরাহ্নের সূর্যালোকে ঝলমল করছিল।

ঘরের মধ্যে বেশ গুছিয়ে যখন একটু বিশ্রাম নিতে বসেছি, সেই সময় রিসেপশনের সুদর্শন ছোকরাটি একতাড়া বিভিন্ন রঙের ফুলসুদ্ধ একটি পাত্র এনে আমার ঘরটিতে হাসি মুখে রেখে গেল।

ছোট ছোট ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনাটা রুচিকর নয়। আমার পরিচয় সামান্য, কিন্তু বহির্ভারতে তার তিলমাত্রও মূল্য নেই। সুতরাং বিদেশে আত্মাভিমানী হয়ে থাকা ছেলেমানুষী। যাই হোক, স্নানাদি সেরে যখন সুস্থ হয়ে বসেছি, একটি ছোকরা এসে সবিনয়ে বলল, আপনার টিফিন কি ঘরে এনে দেব?

বললুম, না, আমি যাচ্ছি।

দরজায় চাবি দিয়ে লন ঘুরে এসে পশ্চিমের মস্ত চওড়া বারান্দায় যখন একখানা চেয়ারে বসেছি, একটি যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এসে আলাপ করল। সে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। ঠিক তরুণ নয়, বয়স্ক যুবক। এমন মিষ্টভাষী এবং আমোদপ্রিয় যে সহজেই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। সময় বিশেষে আমিও হালকা রসের পথ ধরি। আধুনিক সিংহলী মেয়ে, সিনেমার ছবি, হিপির প্রাদুর্ভাব, আসন্ন নির্বাচনের হুজুগ, সিংহলীদের জীবনযাত্রা,—এসব আলোচনায় হাসির হুল্লোড় আসে। আমাদেরই ড্রাইভারের কাছে এ ভদ্রলোক কিছু শুনে থাকবেন, সেজন্য আমার সম্বন্ধে যেমনই আগ্রহ তেমনি অনুরাগ। কিন্তু চেহারায় আর কথাবার্তায় আমরা কেউ কারোকে বিদেশী ঠাওরাতে প্রস্তুত নই। তিনি যখন শুনলেন ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙ্গালীরা কোনও ধর্মবাদকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে না, এবং দর্শনতত্ত্ব যুক্তিবাদ ছাড়া আমরা গ্রহণ করিনে, এবং প্রগতিবাদই বাঙ্গালীর মর্ম স্পর্শ করে সকলের আগে, তখন তিনি আরও কাছে সরে এলেন উৎসুক হয়ে, আমি তখন ভাবলুম, ওষুধ বোধহয় ধরেছে!

এক সময় প্রশ্ন করলুম, আপনার যে বয়েস তাতে তো ঠিক ছাত্র মনে হচ্ছে না? সবিনয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমি পুলিশে চাকরি

করি। আমি এখানকার এ, এস, পি! আমার নাম জি, বি, কোটাকাদেনিয়া। এখন আমি অনুরাধাপুরের চার্জে আছি।

তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলুম। এবার হেসে বললুম, আমি তো এখনও এমন কিছু অপরাধ করিনি যে, সিলোন গভর্ণমেণ্ট আমার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবেন?

কোটাকাদেনিয়া উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন, এবং সে হাসি আর থামতে চায় না। এক সময় নিজেই সোৎসাহে ফস করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আসছি একটু বাদে। আপনি কিন্তু ঠিক এইখানে চুপটি করে বসে থাকবেন—

উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন। হোটেলের দরজায় তাঁর বিলেতী গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। আমি টিফিন ও চা নিয়ে বসে গেলুম।

বেশি নয়, আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটি যুবকের দল নিয়ে ফিরে এলেন কোটাকাদেনিয়া। সঙ্গে তার স্ত্রী। মেয়েটি মোটামুটি ইংরেজী জানে, এবং শাড়ি জড়িয়ে সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মতই এসে সামনে বসে গেল। তিনটি সমবয়স্ক যুবকও বসে গেল আশেপাশে, যেন কতকালের পরিচয়। মেয়েটিকে বললুম, তোমার ছেলেমানুষ বয়েস, তুমি ওই অকালবৃদ্ধকে বিয়ে করতে গেলে কেন? এরা যে সবাই বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ! সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বললুম, বৌদ্ধদর্শনের নীতি নিয়ে তোমরা বুঁদ হয়ে আছ। আড়াই হাজার বছরে তোমরা একপা এগোও নি! এত শান্ত, এত ভদ্র, এত নিরীহ—তোমাদের দেখলে দুর্ভাবনা হয়।

বারান্দায় হৈ চৈ শুনে দূরের ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে আমার সঙ্গী আগরওয়ালা বেরিয়ে এলেন। তাঁর স্থুল চেহারা, মুখশ্রী এবং বৃহদাকার উদরের স্ফীতি লক্ষ্য করে ওদের মনোভাব কি প্রকার হল

সেটা আমার জানার কথা নয়।

মেয়েটি আমার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বলল, আমি কিন্তু এসেছি আপনাকে নেমন্তন্ন করতে। আপনি আজ রাত থেকে আমার ওখানে রোজ দুবেলা খাবেন। আমাদের গাড়ি এসে আপনাকে নিয়ে যাবে!

লড়কি ক্যা কয়তে হেঁ সাব? আগরওয়ালা এগিয়ে এলেন।

আমি আমন্ত্রণের কথা বললুম। উনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, এ হতেই পারে না! আমি এসেছি একই সঙ্গে। আমরা একই লোক। পুলিশ সাবকো কহে দিজিয়ে, হামভি খায়েগা! ম্যায় তো জেয়াদা নহি খাতে! ব্যস, চাওল-চাপাটি যো কুছ মিলে, আওর মুর্গা,—থাড়া থোড়া মিলে তো আচ্ছাই হ্যায়—ওঁর কথাগুলি আমি যুব-সমাজে অনুবাদ করে শুনিয়ে দিতে বাধ্য হলুম। ওরা মিনিট খানেক চুপ করে রইল। ওদের মধ্যে একটি যুবক টেবিলের তলা দিয়ে পুলিশ-সুপারের হাঁটুতে চিমটি দিল। অতঃপর কোটাকাদেনিয়া বললেন, তা বেশ, আপনিও যাবেন!

পুলিশ সুপারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। হেঁটে গেলে মিনিট পাঁচ লাগে। কিন্তু ওঁরা ওইটুকু পথও আমাকে হাঁটতে দিতে প্রস্তুত নয়। তাঁরা আমাকে শাসন করে নির্দেশ করলেন, আপনি এই অনুরাধাপুরার সব অঞ্চল ভ্রমণ করবেন আমাদের গাড়িতে। এটা ধরে নেবেন আপনি আমাদের অতিথি। রাত্রে গিয়ে শুধু হোটেলে শোবেন।

সেদিন রাত্রের ডিনারে কোটাকাদেনিয়াদের ওখানে সবাই মিলে জন দশেক মেয়ে ও যুবক উপস্থিত ছিল। আমি ওদেরকে তাতিয়ে তুলেছিলুম সেক্সরোমান্স ও পলিটিকস আলোচনা দিয়ে। আমার এখন বয়স হয়েছে, মুখের আগল কম। কিন্তু ওদের সেদিনকার হাস্যের হৈ চৈ ও অনর্গল মুখরতায় ফ্ল্যাটটি যেন উৎসব-আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল।

মিঃ আগরওয়ালার খাওয়ার চেহারাটা ওদের পক্ষে আমোদের

বিষয় ছিল। সুবিধা ছিল এই, উনি ইংরেজি কম বোঝেন। ওঁর সেই 'চাওল ও মুর্গা, খাবার কালে মুখের ভিতর থেকে এক প্রকার অস্বাভাবিক আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল—যেটি তিন চারটি বিবাহিত ও শিক্ষিত মহিলা এবং পাঁচ ছয়জন যুবকের পক্ষে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

আহার শেষে আগরওয়ালা আগেভাগেই বিদায় নিয়ে গেলেন। ওঁর যাবার পরে চিতাবাঘের পক্ষে হরিণের মুণ্ড চিবোবার কথা উঠেছিল।

সেদিন হোটেলে যখন ফিরলুম, রাত বারোটা বেজে গেছে।

বাঙ্গলা দেশের কোনও এক বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন যুগের কোনও এক রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ শ্রীলঙ্কা জয় করেছিলেন, এটি সঠিকভাবে ঐতিহাসিক সত্য কিনা আমি জানি না। কিন্তু এ ঘটনা ঐতিহাসিক বলেই এতকাল চলে এসেছে। সিংহলের ইতিহাসে দুটি সত্য আজও স্থির হয়ে আছে। প্রথমটি, পূর্বোক্ত রাজকুমার বিজয়সিংহ এদেশের নামকরণ করেন সিংহল এবং একটি জাতি সৃষ্টি করেন—যার নাম সিংহলী, এবং যার থেকে অদ্যাবধি যে ভাষাটি চলেছে তাঁর নাম সিন্‌হালা! দ্বিতীয় সত্য এদেশে স্বীকৃত, সেটি 'বাহু বংশ।' সিংহলে সেই বাহু-বংশের রাজা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। এসব কাহিনী সম্ভবত সম্রাট অশোকের আমলের। কিন্তু আমি সঠিক সবটা জানিনে।

অনুরাধাপুরা নামটি আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হলেও এটি আসলে অনুরাধ-অ। কথিত আছে রাজকুমার বিজয় সিংহের জনৈক অনুগামী নাম ছিল 'অনুরাধ-অ' তিনিই এখানে প্রথম বসবাস স্থাপন করেন। এর বহু বছর পরে অপর একজন সিংহলী রাজপুরুষ

তদানিন্তন রাজার অনুগ্রহে এখানে আধিপত্য লাভ করেন। তাঁর নাম ছিল অনুরাধ-অ। তবে প্রশ্ন থাকতে পারে বিজয় সিংহের অনুগামী একজন নারী বা পুরুষ অনুরাধা নামে ছিলেন কিনা। যাই হোক, দুটি 'অ' মিলিয়ে 'আ' হয়েছে কিনা সেইটিই বিচার্য। সিংহলীরা বলেন, সেইটিই সত্য। স্ত্রীলোক এর মধ্যে মাথা গলায়নি।

ভারতের সর্বাধুনিক কালে কাশী তাঁর জাত হারিয়েছে। কিন্তু বাঁদর নাচ, সাপ খেলানো, ম্যাজিক অথবা বাছ নাচ দেখাতে পারলে দর্শকরা যেমন ঠুনঠুন করে পয়সা ফেলে, তেমনি বিদেশী ট্যুরিষ্টদের নানা লোভ দেখিয়ে ভারতে এনে এই কদর্য নোংরা শহর কাশীকে দেখানো হয়! তাঁরাও ঠুনঠুন করে ষ্টার্লিং পাউণ্ড বা ডলার ফেলে যায়। অনুরাধাপুরা এখনও এত নীচে নামেনি। যাই হোক এই ছোট্ট নগরীটি প্রথম রাজধানী-স্বরূপ নির্মিত হয় সিংহলী রাজা পাণ্ডুকাভয়ার আমলে খৃষ্টপূর্ব ৩৮০ সালে সম্রাট অশোকের আগে। তখন দুই অনুরাধ-অ মিলিয়ে বহুবচনে এর নাম হয় অনুরাধাপুরা। এ নামটি সম্পূর্ণ ভারতীয়।

কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিনীর' মত সিংহলের রাজবংশের ইতিহাসের নাম 'মহাবংশ'। মহাবংশে রয়েছে, রাজা পাণ্ডুকাভয়ার আমলে প্ল্যানিং এমনভাবে করা হয়েছিল যে ঝাড়ুদার বা চণ্ডালরা থাকবে এক অঞ্চলে, আরেক অঞ্চলে থাকবে যোনা বা যবনরা—যারা মধ্যপ্রাচ্যের লোক। ভিতরে ভিতরে তখন জাতিভেদ ছিল প্রচুর। সে সব চিহ্ন আজও রয়ে গেছে।

রাজা পাণ্ডুকাভয়ার পৌত্র রাজা দেবনামপিয়তিস্‌সর কালে সম্রাট অশোকের পুত্র রাজকুমার মহেন্দ্র বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে তাঁর ভিক্ষু দল সহ সিংহলে এসে পেঁছিয়, এবং নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গুহায় সদলবলে আশ্রয়লাভ করেন। পরবর্তীকালে এই পুণ্য পাহাড়ের নাম রাখা হয় 'মহেন্দ্রতাল।' আধুনিক সিন্‌হালা ভাষায়

'মিহিনতেল।' সংস্কৃত শব্দের বিকৃতি সিংহলের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। খৃষ্টপূর্ব ২৫০ সাল থেকে ২১০ সাল পর্যন্ত দেবনামপিয় সিংহলে রাজত্ব করেন।

অতি অল্পকালে এই রাজার উদ্দীপনায় বৌদ্ধধর্মের তরঙ্গ জোয়ার সিংহলকে প্লাবিত করে। অনুরাধাপুরার হৃৎকেন্দ্র যে রাজকীয় পুষ্পারণ্য, সেই 'মহামেঘ কানন' বিরাট একটি বৌদ্ধমঠে পরিণত হয়। সমগ্র সিংহলের অধিবাসীরা এই পুণ্যতীর্থে সমবেত হয়ে বুদ্ধের পবিত্রবাণী ও মন্ত্র নতশিরে গ্রহণ করে।

রাজকুমার মহেন্দ্রের সঙ্গে রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রা একত্র গিয়েছিলেন কিনা, অথবা উভয়ে পৃথক, এ গবেষণা আমার কাজ নয়। তবে যতদূর মনে হয় সঙ্ঘমিত্রা পরে গিয়েছিলেন। বুদ্ধগয়া থেকে মূল বোধিবৃক্ষের একটি চারা মাথায় করে নিয়ে তিনি জাফনায় অবতরণ করেন, এবং তারপর সেটি অনুরাধাপুরায় এনে 'মহামেঘ কাননে' মহাসমারোহে রোপন করেন। সেই থেকে এটির নাম হয়ে আছে 'শ্রীমহাবোধি বৃক্ষ।' পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও একটি গাছ ২২০০ বছর ধরে বেঁচে আছে, এ কারও জানা নেই। কিন্তু অনুরাধাপুরার এই গাছটি বিগত ২২০০ বছরে যেমন শুকিয়েও যায়নি, তেমনি মহামহীরুহেও পরিণত হয়নি। গাছটি যথেষ্ট বড় নয়, তিনতলা সমান, ডালপালাও অনেকগুলি, প্রসারও কম নয়,—কিন্তু এর বলিষ্ঠতা কম, গুঁড়ি বা ডাল যথেষ্ট স্ফীতকায় নয়, হাড়ের মধ্যে যেন কিছু দুর্বল। এই সকল কারণে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গাছটিকে রক্ষা করার জন্য এর আগাগোড়া লোহার ফ্রেমের সঙ্গে বড় বড় লোহার হাতল বাঁধানো রয়েছে, যাতে তাদের উপর ভর দিয়ে এ গাছটি আত্মরক্ষা করতে পারে। এ গাছের পাতা কেউ কখনও ছেঁড়ে না, বা গাছটিকে স্পর্শ করে না। কিন্তু হাওয়ায় পাতা ঝরে বৈকি। সেই পাতা মহামূল্য। বেশ মনে পড়ে, কাশীর বেদান্ত আশ্রমের

সন্ন্যাসী স্বামী অপূর্বানন্দ কয়েক বছর আগে অনুরাধাপুরা থেকে পার্সেল করে আমাকে একটি পাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আমি সশরীরেই এখানে উপস্থিত হয়েছি।

আমাদের হোটেলের বাগানের ধারে একটি বিরাট সরোবর। এটির নাম 'নুয়ারা বেবা' দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেকটা, বাগানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। এর তীরে তীরে হাঁটা পথ আছে বহুদূর পর্যন্ত। কিন্তু এরূপ জলাশয় আরও আছে কয়েকটি নগরের আশেপাশে। যেমন, 'তিস্কবেবা, বাসবক কুলম, বুলন-কুলমা' ইত্যাদি। বৌদ্ধ মঠ বা মন্দির এখানে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন দাগাবা, থুপ, তোপ, স্তোপ, সেয়া স্তূপ, চেতিয়, বেহেরা। এর মধ্যে তিনটি শব্দ আমাদের কাছে পরিচিত—স্তূপ, চৈত্য ও বিহার। অনুরাধাপুরার স্থিতি যে ভূভাগটির উপর, সেই ভূভাগটির নাম ছিল রাজারৎ অর্থাৎ রাজা-আড়ৎ, বা রাজভূমি। এর আদিতে অনেকে বলে, 'অনুভ'—অনুভ অর্থে নব্বই। নব্বই জন রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন, যদিচ 'মহাবংশে' বলে একশ উনিশ জন।

এই সকল পরিভ্রমণের মধ্যে মনে হচ্ছিল বহু পথ ও বহু স্থলের নামের সঙ্গে আমার যেন কতকালের পরিচয়। যেমন বাতাবন্দনা রোড, রত্নপ্রাসাদ ; জেতবনরমায়া, লঙ্কারমায়া, মহাপালি, বেশগিরি, ঈশ্বর মুনিয়া, পূর্বরমায়া, মিশ্রবতী, নখবিহার। আরও অনেক।

দাগাবা বললে এখানে বৌদ্ধমন্দির স্তূপ বুঝতে হবে। গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর দেহাবশেষের বহু অংশ বহু জাতি ও বহু দেশ এবং বহু ভিক্ষু দল ভাগাভাগি করে নেয়। বুদ্ধের দাঁত ও কণ্ঠার অস্থি আসে সিংহলে। অনুরাধাপুরায় থুপরামা দাগাবায় এই অস্থি সমাধিস্থ করেন রাজা দেবনামপিয়। এই স্তূপটি পুনর্গঠিত হয় এই সেদিন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। বনময় এই ভূভাগে ভিতরে ভিতরে একটির পর একটি 'বিহার' যেন কালজয়ী মহাকীর্তির মত দাঁড়িয়ে

রয়েছে। যেমন রুবনবালসেয়, অভয়গিরি মঠ ও স্তূপ, সমাধি-বুদ্ধের বিরাট মূর্তি যেটি ৪র্থ শতকে 'তোর কুত্তম পোকুনা' নামক দুটি পাথর বাঁধানো প্রাচীন সরোবর. 'কন্টক চেতিয়।'

বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধদর্শন বা নীতি বললে ভারতীয় মন যেন একটু খুশী থাকে। আন্দাজ একশ বছর পরে যখন বৌদ্ধধর্ম সিংহলে শিকড় নিয়ে বসেছে তখন দাক্ষিণাত্যের চোলারাজ 'ইলারা' খৃষ্টপূর্ব ১৬১ সালে অনুরাধাপুরা আক্রমণ করেন এবং তাঁর আধিপত্য স্বীকৃত হয়। ইনি জাতিতে ছিলেন তামিল। এই সময়ে সিংহলের আদিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটে। সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব সাগরতীর অঞ্চলে 'গামিনী দুত্থ' নামক এক রাজকুমার ছোটখাটো নানা সংঘর্ষে জয়লাভ করে অবশেষে সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুরার সন্নিকটে এসে ইলারাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন, এবং সম্মুখ যুদ্ধে গামিনীর হাতে ইলারা হত হন। কিন্তু যেহেতু ইলারা ছিলেন মহাতেজস্বী সেজন্য গামিনী দুত্থ তাঁর দেহ সমাধিস্থ করে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। ইলারার সমাধি স্তম্ভটি দুহাজার বছর ধরে রয়েছে। পরে গামিনী দুত্থ নিজেই বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিচালনার ভার নেন।

খৃষ্টপূর্ব একশ বছরের মধ্যে বলাগম বাহুর রাজত্বকালে আবার তামিল আক্রমণ ঘটে এবং বাহুরাজ পলায়ন করেন। পরবর্তী চৌদ্দ বছর কালের মধ্যে মোট পাঁচজন তামিল রাজা বলাগম বাহুর সিংহাসনে বসেন। অবশেষে জনশক্তি সংগ্রহ করে বলাগম বাহু আবার তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন।

বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে তন্ত্রসাধনার যোগ কি পরিমাণ আছে সেটি বিশেষজ্ঞরাই জানেন। শুনেছি এককালে বৌদ্ধ তিব্বতের থেকেই নাকি বাঙ্গলায় তন্ত্র সাধনার ধারা চলে আসে। দেবী কালিকার উপাসনার মহলই নাকি তন্ত্র সাধনার কেন্দ্র হয়ে উঠত। আমার

তিব্বত ভ্রমণকালে বহু বৌদ্ধগুম্ফায় দেখেছি কালী বা তারার ভীষণা, ভয়ঙ্করী ও রাক্ষসী মূর্তি। শুনেছি কোন কোনও গুম্ফা তন্ত্র সাধনারও কেন্দ্র এবং সেখানে বলিদানও ঘটে।

তৃতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধরাজ মহাসেনের আমলে অনুরাধাপুরায় তন্ত্র সাধনার রীতি প্রচলিত হয়। রাজা মহাসেন এইপ্রকার সাধনার যাঁরা অগ্রণী এমন ৬০ জন ভিক্ষুকে রাজধানী থেকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই তন্ত্রসাধনার ধারা রাজসক্তির আনকূল্য লাভ করে।

এইভাবেই চলে এসেছে অনুরাধাপুরার ইতিহাস। পরবর্তী ৬০০ বছর ধরে এই রাজধানীর সম্পদ ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। অরণ্য ও তপোধন সহ যে অনুরাধাপুরা মহাপ্রাচীনের একটি পরিচয় বহন করত, সেটি তার সম্পদ সমৃদ্ধির ফলে রাজন্যবর্গের ঈর্ষা ও কলহ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে, দাক্ষিণাত্য থেকে আবার তামিল আক্রমণকারীরা প্রভুত্ব নেবার চেষ্টা পেতে থাকে। অবশেষে অনুরাধাপুরা থেকে রাজধানীকে দূর দক্ষিণের দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। পিছনে পড়ে থাকে পুরাকালের অগণিত অসংখ্যক বৌদ্ধকীর্তি।

কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের। আচার্য শঙ্করের অভ্যুত্থানের পর ভারতের মূল ভূখণ্ডের থেকে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ প্রভাব কমে আসে এবং বৌদ্ধ কীর্তিগুলি একে একে মাটি চাপা পড়ে। কাশ্মীরে বিভিন্ন বৌদ্ধ কীর্তি, সাঁচী স্তূপ, উদয়গিরি, কাশীর সারনাথ, গয়ার বৌদ্ধমন্দির, তক্ষশীলার কীর্তি অজন্তা-এল্লোরা, কুশীনগর,—এবং আরও অনেক—এগুলি মানুষ ভুলতে থাকে। ঠিক অনুরাধাপুরায় তাই ঘটে। অদ্বৈতবাদী তামিলদের আধিপত্যের ফলে উত্তর ও পূর্ব সিংহলে বৌদ্ধরা নিজে প্রতিষ্ঠা হারায়, এবং অনুরাধাপুরা বন-জঙ্গলে চাপা পড়ে। বাঘ,

ভালুক, বুনো হাতী, সাপ এবং অন্যান্য জন্তুর ভয়ে ওদিকে আর কেউ যেত না, সুদীর্ঘ এক হাজার বছর অবধি অনুরাধাপুরার খোঁজখবর কেউ রাখেনি।

অবশেষে ডাচদের তাড়িয়ে ইংরেজ এসে দাঁড়াল সিংহলে ১৮শ শতকের শেষ প্রান্তে এবং মাত্র ২০ বছরের মধ্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তারা অনুরাধাপুরাকে নতুন করে আবিষ্কার করল। আবিষ্কার যিনি করলেন তিনি সিংহলের তদানীন্তন তরুণ প্রতিনিধি মিঃ রাল্‌ফ্‌ ব্যাকহাউস। প্রায় ওই একই কালে এক ইংরেজ শিকারী দাক্ষিণাত্যের এক পার্বত্য জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে গিয়ে দূর থেকে অজন্তার গুহাগুলি আবিষ্কার করে। সেই স্থলটি আজও রয়েছে অজন্তার গায়ে টিল-পাহাড়টির চূড়ায়। কে না জানে, মোট ৮০০ বছর ধরে অজন্তার গুহাচিত্রগুলি খোদিত ও অঙ্কিত হয়। ভারতই হোক, আর সিংহলই হোক—বৌদ্ধ যুগই এই দুই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। আর সেই পরিচয়কে যারা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁদের মধ্যে কানিংহাম, জন মার্শাল ও লর্ড কার্জন-এদের নাম স্থায়ী হয়ে রয়েছে।

অনুরাধাপুরার মাঠে-ময়দানে, জলাশয়ের ধারে, পাহাড়ি বড় বড় পাথরের গায়ে-গায়ে—প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধকীর্তি খোদিত ও চিহ্নিত। মাঝে মাঝে তাদের বিশালতার মহিমা মনকে অভিভূত করে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের যে-মূর্তি দেখেছি বোম্বাই-সমুদ্র মধ্যস্থিত হস্তীগুম্ফায়, এখানে যেন তারই দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে খোদিত বুদ্ধের যে বিরাট দণ্ডায়মান মূর্তিটি দেখতে পাওয়া যায়, বোধহয় ভারতবর্ষের কোথাও তার দ্বিতীয় নেই।

রাজকীয় কাননগুলি প্রাচীন শোভা ও সম্পদ আজ অবশ্য চোখে পড়ছে না, কিন্তু সেইকালের কৃত্রিম নদীপ্রবাহ সৃষ্টির কৌশল, স্নানাগারগুলির সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠা বা ‘লে-আউট’, মন্দিরগুলির

গঠনকৌশল এবং ভিক্ষু সম্মেলনের ক্ষেত্রগুলি—এসব কীর্তি দেখে যাবার মত। রাজকুমার মহেন্দ্রর কালে যে বিহারটি নির্মাণ করা হয়েছিল সেটির স্থানীয় নাম 'ঈশুরুমুনিয়া' অর্থাৎ ঈশ্বরমুণি। সেটি জলাশয় তীরবর্তী এক পাহাড়ি পাথরের কোলে মঠ এবং স্তূপ। আধুনিক কালে এখানে যাত্রীশালা ও বিশ্রামাগার তৈরি হয়েছে।

ভারতে বৌদ্ধস্থাপত্য কীর্তির সঙ্গে জলাশয় প্রতিষ্ঠার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সিংহলে এর বিপরীত। লবণাক্ত সমুদ্র চারদিকে মাঝে মাঝে নদী ক্ষীণধারা—যাদের ঘোলাটে জল যথেষ্ট পানযোগ্য নয়। বিশেষ করে উত্তর সিংহল মরুময় ও রুক্ষ। সেই কারণে রাজকীয় কীর্তির প্রথম স্বাক্ষর থাকত ছোট বড় জলাশয় প্রতিষ্ঠায়। জীবনকে সর্বত্র ধারণ করে থাকে স্বচ্ছ সুশীতল পানীয় জল—সেই জল আকাশ থেকে নামে মহাশূন্যের থেকে আশীর্বাদের মত। একসময় পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে রাঢ়ভূমিতে জলাশয় প্রতিষ্ঠা ছিল পুণ্যকর্ম। এখন পুকুর বুঁজে যাচ্ছে, নলকূপ তার জায়গা নিচ্ছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগে বাঙ্গলায় নলকূপের বা টিউব-ওয়েল-এর চলন ছিল না।

অনুরাধাপুরা থেকে বিদায় দেবার আগে 'শ্রীমহাবোধিবৃক্ষ বিহারে' উপস্থিত হলুম। সামনেই প্রাচীর, আশেপাশে নিরিবিলি বন-বাগান। প্রাচীর পেরোলে একটি অঙ্গন, তারপর প্রবেশ পথ। ভিতরে যেমন হয় বুদ্ধপূজা, ধূপ ও দীপ, জলের পাত্রগুলি সাজানো—যেমন বুদ্ধ পূজায় লাগে। বুদ্ধপূজার প্রথম উপকরণ জলের পাত্র—যেমনটি দেখেছি সিকিমের দরবার গুম্ফায়, দার্জিলিংয়ের ঘুম-এ, কার্সিয়াং ও কালিম্পংয়ে, ভারতের নানা বুদ্ধ-স্থলে এবং পশ্চিম তিব্বত ও লাদাকে। জল হল জীবন দানের সর্বপ্রধান উপকরণ।

ভিতরে প্রবেশ করলেই ডানদিকে সেই কালবিজয়ী বোধিবৃক্ষ। গাছটি বট নয়, অশ্বত্থ। অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা, অনেক বাঁকা

ভঙ্গী এবং অনেকটা যেন অষ্টাবক্রের জটলা। গুঁড়ি কোথাও স্ফীত নয়, বড় বড় ডালগুলো যথেষ্ট মজবুত নয়। মহীরুহে পরিণত হবার মত কোনও সঙ্কেত নেই। এ যেন জন্মপরম্পরায় এক 'রিকেটি' শিশু—যার বৃদ্ধিও কম এবং স্বাস্থ্যও অনুন্নত। কোমরের জোর নেই, মেরুদণ্ড দুর্বল—সেইজন্য লোহার কয়েকটি 'ক্রাচ' ফ্রেমের আকারে তৈরি করে গাছটিকে ভর দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সিংহলরাজ দেবনামপিয়তিস্‌স তাঁর এক প্রতিনিধিদলকে মিশনারী হিসাবে সম্রাট অশোকের রাজ দরবারে পাঠান, পাটালিপুত্রে সম্রাট তখন চণ্ডাশোক থেকে ধর্মশোকে পরিণত হয়েছেন এবং তাঁর রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষ তখন সমাগত। প্রতিনিধি দলটি তাম্রলিপ্তি হয়ে পাটালিপুত্রে পোঁছেছিল মাত্র দুই সপ্তাহে। এই মিশনের সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্রাট অশোক তাঁর ভিক্ষুপুত্র কুমার মহেন্দ্র ও দৌহিত্র শ্রীমান সুমনকে সদলবলে সিংহলে পাঠিয়ে দেন। এরপর আরেকটি মিশন আসে সম্রাটের দরবারে। তাঁরা প্রার্থনা করেন রাজকন্যা সঙ্ঘমিত্রা তাঁদের সিংহলে পদধূলি দান করুন এবং গয়াস্থিত বোধিদ্রুমের একটি চারা স্বহস্তে অনুরাধাপুরায় রোপন করে আসুন।

তথাস্তু। সম্রাট নিজে সেই বোধিবৃক্ষের চারা সংগ্রহ করলেন এবং তাঁর সৈন্য সামন্তসহ বিরাট এক শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে তাম্রলিপ্তের বন্দরে এসে সকলকে সমুদ্রযানে তুলে দিলেন। শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা সেই চারাটি মাথায় নিয়ে জাফনার তীরে নেমে অনুরাধাপুরায় এসে মহাসমারোহে সেটি রোপণ করেন—আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক সামনে। এর পরও সিংহল থেকে তৃতীয় একটি মিশন আসে এবং তার সঙ্গে সঙ্ঘমিত্রা তাঁর পুত্র শ্রীমান সুমনকে এবার পাঠিয়ে দেন পিতার নিকট একটি অনুরোধ জানিয়ে। কন্যার সেই অনুরোধের ফলে সম্রাট পাঠিয়ে দেন বুদ্ধের

সংরক্ষিত দু একটি দেহ-চিহ্ন—যেমন দাঁত ও অস্থির টুকরো। কিন্তু সিংহল নগরী কাণ্ডির দন্ত মন্দিরের সঙ্গে এই ইতিহাসটি সঠিক মেলে না। সে যাইহোক, অনেকের ধারণা এই ঘটনাগুলিই অজন্তার গুহায় একটি দেওয়ালে চিত্রিত করা রয়েছে। অশোকের কালের নানা শিলালিপিতে সিংহলের নাম দেওয়া হয়েছিল 'তাম্রপর্ণী।'

সঙ্ঘমিত্রার এই কাহিনী সিংহলে সুবিদিত। কিন্তু অপর যে ভারতীর নারীটি সিংহলের সর্বত্র প্রচারিত, সেই শ্রীমতী কল্যাণী রাজকুমার মহেন্দ্রের স্ত্রী অথবা ভগ্না অথবা সঙ্ঘমিত্রার অপর একটি নাম কল্যাণী—এটি নির্দিষ্ট জানা যায় না। কিন্তু কল্যাণীর নামে কেলানী জনপদ, কেলানী গঙ্গা, কেলানিয়া বাজার ইত্যাদি রয়েছে। আমার সাময়িক কালের প্রিয়বন্ধু সিংহলের বিদ্যালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টি বিমলানন্দ মহাশয় বাস করেন কেলানিয়াতে। কল্যাণীর সঠিক সংবাদ হয়তো মহাবংশে পাওয়া যেতে পারে। বিদায় নেবার আগে আমি মহাবোধিবৃক্ষ সংলগ্ন বৌদ্ধমঠের মধ্যে ঢুকে প্রাচীন অধ্যক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালুম। দোভাষী ছিলেন একজন। অধ্যক্ষ মহাশয়ের বয়স ৮৫ বছর, এবং তিনি জরাজীর্ণ। নাম শ্রীসুমন রেবত আত্মস্থান, এবং তাঁর এই আশ্রয়টির নাম ও ঠিকানা, বোমালুব পানসালা, অনুরাধাপুরা। তিনি সমগ্র উত্তর ও পূর্ব সিংহলের সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পুরোহিত। শান্ত, নম্র, নিরভিমান এবং মধুরভাষী বৃদ্ধ।

আগের দিন তাঁর কাছে অনুরোধ জানানো ছিল, অশ্বত্থের পাতা যদি দু একটি ঝরে পড়ে, আমাকে দয়া করে দান করবেন। নিয়ে যাব।

শ্রীসুমন রেবত দুটি পাতা আমার হাতে দিলেন। পাতা দুটি নিয়ে অনুরাধপুরা ত্যাগ করলুম। পাতা দুটি ঝরে পড়েছিল গত রাত্রে।

পথে এসে মিঃ আগরওয়ালা বললেন, পিপ্পল পেহড় কি পাত্তি ক্যা হোগা?

তাঁকে জানালুম, এই অশ্বত্থপত্র অতি পুণ্যময় ও পবিত্র।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এই যে এতগুলি মূর্তি দেখলুম, একি সব রাবণের?

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললুম, না, এ সবই গৌতম বুদ্ধের।

মহেন্দ্রতাল থেকে 'মিহিনতেল।' এটি একটি পাহাড়, অনুরাধাপুরা থেকে আট মাইল দূরবর্তী। এই পাহাড়ের উপরে বৌদ্ধ মঠটিতে পৌঁছতে গেলে মোট ১৮৪০টি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। পরিশ্রম অপেক্ষা কিছু ধৈর্যের প্রয়োজন। ভিক্ষু রাজকুমার মহেন্দ্র প্রথম সিংহলে এসে সদলবলে এই পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। এ ব্যাপারে সিংহলের ঐতিহাসিকদের জবানী অন্য প্রকার। তাঁরা বলেন, মহেন্দ্র আর সঙ্ঘমিত্রা নিজে এসেছিলেন, কেউ ডেকে আনেননি। তাঁরা নাকি সদলবলে এসে এই পাহাড়ের এক জনহীন অংশে গুহাবাসী হয়েছিলেন। অতঃপর একদা রাজা দেবনামপিয় এই পাহাড়ে উঠে আসেন। সেদিন তাঁদের ছিল জলক্রীড়া, ব্রহ্মদেশের জলক্রীড়ার মত। সেই সময় ঐ পাহাড়টির নাম ছিল মিচ্ছক। তাঁরা যখন ঐ মিচ্ছক পাহাড়ের উপর উঠে এসেছেন, তখন ঐ পাহাড়ের দেবতা এক হরিণের ছদ্মবেশ ধরে রাজাকে তাঁর চল্লিশ হাজারজন সঙ্গী-সাথী সহ পথ ভুলিয়ে নিয়ে যায় কুমার মহেন্দ্রর গুহার দিকে।

অর্থাৎ ওঁরা বলতে চান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের গরজটা ছিল ভারতের, সিংহলের নয়। ওটা যেন অনেকটা সিংহলের ওপর চাপানো। কিন্তু বিতর্কের বাইরে এলে দেখা যায়, উপরোক্ত রূপটি কিছু অবাস্তব।

মৃচ্ছক বা মুচ্ছক পাহাড়টি হল একক, কোনও পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে তার যোগ নেই। ঝরণা যদি থাকেও, সেখানে ৪০ হাজার লোকের পক্ষে জলক্রীড়া সম্ভব নয়। হরিণের গল্পটা প্রক্ষিপ্ত। রাজকুমারও মহেন্দ্র নিজে সম্রাট-পুত্র হয়ে আত্মগোপন করে থাকবেন কেন একটি ভিনদেশে এসে?

সিংহলের ঐতিহাসিকরা আজও বলেন, সিংহলের ইতিহাস জটীল, অসংলগ্ন এবং পরস্পর বিরোধী, তাঁদের নিজেদের ইতিহাস জানবার কোন সুযোগ তাঁদের ছিল না। তাঁদের ইতিহাসে একটি-মাত্র ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়, সেটি হল এই—ভারতের নিকট থেকে সিংহল শুধু গ্রহণই করেছে, প্রতিদান দেবার কোনও চেষ্টা করেনি। সিংহলের নিজস্ব কোন সংস্কৃতি নেই—যেটি আছে সেটি ভারতেরই কাছে পাওয়া, সেটি বৌদ্ধসংস্কৃতির একটি সামান্য টুকরো মাত্র, তা নিয়ে আত্মাভিমান করা বেমানান। সিংহলের আধুনিক কালের ছেলেমেয়েরা সিংহলের ভ্রান্ত ইতিহাস পড়ার আগে ভারতের কিছু কিছু প্রামাণ্য ইতিহাস মন দিয়ে পড়ে নিলে নিজেদের দেশের পরিচয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। রাষ্ট্রনীতির দ্বারা প্রকৃত ইতিহাসের তথ্যগুলি প্রভাবিত হয়, এটি কাম্য নয়।

'মিহিনতেল' পাহাড়ে এখানে ওখানে ঘুরে দেখেছিলুম। এখানে কণ্ঠকচৈত্য, ওখানে 'সিংহপকুনার' স্নানাগায়—প্রস্তর-সিংহের মুণ্ডের দ্বারা এক অঞ্চল অকীর্ণ। এরপর 'নাগপকুনা'—এটি সাতটি সর্প-ফণার দ্বারা শোভিত এক মহানাগ চিহ্নিত জলকুণ্ড। 'কালুদিয়াপকুনা' —এটি একটি রহস্যকুণ্ড, অনেকখানি পাহাড় ঘুরে গিয়ে এই 'হামাম' জাতীয় স্নানকুণ্ডে পোঁছানো যায়। প্রস্তরের বিচিত্র ভাস্কর্যে এক একটি তোরণ সুদৃশ্য হয়ে রয়েছে। এদেরই কাছাকাছি এক গুহায় যে শয্যা রচনার স্থলটি চোখে পড়ে সেটি নাকি ভিক্ষু মহেন্দ্রর শয্যা-স্থল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ হল 'অম্বাস্থল চৈত্যবিহার'।

এটি দর্শনীয় মন্দির।

আগাগোড়া দেখেশুনে কেবল ইতিহাসের এই সাতটি পাওয়া যায় যে, সম্রাট পুত্র মহেন্দ্র যখন সর্বত্যাগী ভিক্ষুর বেশে সিংহলে উপনীত হন তখন রাজা দেবনামপিয়তিস্‌স তাঁর চল্লিশ সহস্র দেশবাসী সহ অগ্রসর হয়ে ভারত সম্রাটের পুত্রকে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু ভিক্ষু মহেন্দ্র তাঁর জীবনযাত্রায় বৌদ্ধভিক্ষুর পক্ষে প্রচলিত নিগ্রহ-নীতি পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। সেই কারণে রাজকীয় বিলাস অবহেলায় পরিত্যাগ করে এই নির্জন পাহাড়ে নিজ ভিক্ষুদলের সঙ্গে একত্র বাস করেছিলেন, এবং মৃচ্ছক পাহাড়ের শীর্ষে বসে ভিক্ষু মহেন্দ্র রাজা দেবনামপিয়কে বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই দীক্ষা-দানের সংবাদ পেয়ে সম্রাট অশোক অশ্বত্থ চারাটিসহ সঙ্ঘমিত্রাকে পাঠান এবং পরে শ্রীমান সুমন ফিরে গিয়ে গৌতম বুদ্ধের দেহচিহ্নগুলি নিয়ে আসেন।

এই ঘটনায় সিংহল তার প্রথম সভ্যতার আস্বাদ-লাভ করে বেঁচে ওঠে। এরপর রাজধানী অনুরাধাপুরার সমৃদ্ধি ও সামুদ্রিক রত্ন-সম্ভারের লোভে আসে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা। সেও প্রায় দু হাজার বছর আগেকার কথা। অতঃপর কালক্রমে সিংহলে এসে পৌঁছয় শঙ্করের মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ, আসে দলে-দলে দাক্ষিণাত্যের তামিলরা। তাঁরা এসে গায়ের জোরে জায়গা জুড়ে বসে। নগর তৈরী করে, বাণিজ্যেপোত বানায় এবং তাদের রাজশক্তি স্থাপিত হয়। এদেরই নাম সিংহলী তামিল। কিন্তু সংঘর্ষ রয়ে গেল দুই ধর্মনীতির মধ্যে—একদিকে সংরক্ষণশীল বৌদ্ধনীতি, অন্যদিকে সর্ব-গ্রাসী অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তভাষ্য। এই সংঘর্ষ চলে আসছে অদ্যাবধি। ফলে, সিংহলের আত্মা আজও দুইভাগে বিভক্ত। কিন্তু দুটি ধর্ম-বিশ্বাস পরস্পর বিরোধী। একের ব্যাখ্যা অন্যপক্ষ গ্রহণ করে না। আদিবাসী সিংহলীরা রক্ষণশীল বৌদ্ধ এবং আদিপ্রবাসী তামিলরা

রক্ষণশীল মায়াবাদী। সিংহলীরা কালক্রমে সংখ্যায় যত বেড়েছে, তামিলরা তত পরিমাণেই দলে ভারী হয়েছে। উভয়ের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষাবিধি, পোষাক, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, পাল-পার্বণ—সমস্তই পৃথক। তামিলরা প্রথম থেকেই ছিল উন্নতিশীল ও প্রগতিবাদী, সিংহলীরা প্রথম থেকেই অনুন্নত এবং গোঁড়া বৌদ্ধ। ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ লেগেই থাকে।

ইংরেজ চলে যাবার পর সিংহলীরা এখন ক্ষমতায় আসীন। তারা ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে সর্বপ্রকার উন্নতির পথ বেছে নিচ্ছে। কিন্তু মূল কথাটি তারা ভোলে না, সেটি হল রক্ষণশীল বৌদ্ধনীতি। সমগ্র সিংহলে ৯,৫৫৫টি বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে শৈশব থেকে বৌদ্ধধর্মের নীতি শিক্ষা দেওয়া এবং পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও ও শিক্ষক-অধ্যাপককে।

সিংহল পরম সুন্দর দেশ, রত্নদ্বীপ শ্রীলঙ্কা! কিন্তু সিংহল ভারতের প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন, এমন মনে হয় না। তার বড় সমস্যা—তামিল সমস্যা। তামিল ভারতের একটিমাত্র অংশ মাত্র—সমগ্র ভারত নয়, ওরা তামিলদের দিয়ে ভারতকে বিচার করে। ভারতকে ভয় পায় তামিলদের জন্য। কিন্তু পিতামহ ভারত যে প্রসন্ন আশীর্বাদ নিয়ে ওদের দিকে চেয়ে থাকে, সেটি সিংহলীদের পক্ষে বিশ্বাস করতে বাধে।

॥ চার ॥

প্রজ্ঞাপারমিত গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ঘটে ঠিক সেইদিন যেদিন তিথি অনুসারে তাঁর ৮০ বছর বয়স পূর্ণ হয়। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়, তাঁর জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মৃত্যু—একই তিথিতে ঘটে। সেটি বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। সেই কারণে বৌদ্ধজগতে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনটি অতি পুণ্যতিথি হিসাবে প্রতিপালিত হয়। এই তিথির সমাদর সমগ্র প্রাচ্যে স্বীকৃত। সোভিয়েট ইউনিয়নের বৌদ্ধমঠ-গুলিও এই তিথিটি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে।

যাই হোক, বুদ্ধের দেহত্যাগের পর সেই পুণ্যদেহের একটি টুকরো মহাপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের অনুরক্ত রাজন্যবর্গ, বিভিন্ন সঙ্ঘ এবং আরও আরও অনেকে যারা তাঁর নির্বাণকালে উপস্থিত হয়েছিল তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। এর জন্য নাকি কিছু সংঘর্ষেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু ৮০ বছর বয়সে বুদ্ধের দাঁতগুলি যে সতেজ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দাঁতগুলি বিতরণে। তাঁর এই দাঁত নিয়ে পশ্চিম তিব্বতে একাধিক 'চোর্তেন' বা বৌদ্ধ-সৌধ সৃষ্টি হয়, যেটি আমার 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে লাদাখ ভ্রমণ বিররণে প্রকাশ করেছি। বুদ্ধের একটি বা দুটি দাঁত সিংহলে আসে দেড় হাজার বছর আগে, এবং সম্ভবত তামিলদের আক্রমণ বা উৎপাতের ভয়ে সিংহলীরা বহু শতাব্দী অবধি এই পার্বত্যপ্রাচীর ঘেরা তৎকালীন ক্ষুদ্র জনপদটির এক কোণে সেই দাঁত লুকিয়ে রাখে। অতঃপর ১৮শ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে ওলন্দাজদের আধি-পত্যের কালে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থায় সিংহলীরা এই দাঁতের সংবাদটি ঘোষণা করে। এই দাঁত সিংহলে এসে পেঁছিয় সম্রাট

অশোকের মৃত্যুর সাতাশ বছর পরে কোনও এক ঝুলন-পূর্ণিমার তিথিতে। সেই কারণে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি প্রতি বছর ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে কাণ্ডিনগরে যে বর্ণাঢ্য রাজকীয় শোভাযাত্রার বিপুল আয়োজন করা হয়, সেই চাক্ষুষ দেখার জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকে পর্যটকরা আসে এই কাণ্ডিনগরে। কাণ্ডির এই জগৎপ্রসিদ্ধ দন্ত-মন্দিরটির নাম 'দলদা-মালিগাবা।' এই শোভা-যাত্রায় অগণিত সংখ্যক হাতী এসে তাদের ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা রত্নমণিমানিক্য-ভূষণে ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হয়। বুদ্ধের মূল দাঁতটি বাইরে আনতে সিংহলীরা আজও সাহস পায় না। সেই কারণে এই দাঁতের একটি অবিকল নকল (replica) তারা আগে রাখে একটি ক্ষুদ্র মণিপেটিকায়, সেটি রাখে আরেকটি পেটিকায়, এবং সেটি রাখে তৃতীয় একটি মূল্যবান ও স্বর্ণ-রৌপ্যাধারে···যার অষ্টকোণযুক্ত মণিচূড়াটি বৌদ্ধস্তূপের মত সূচ্যগ্র। অলঙ্কৃত আভরণযুক্ত একটি বৃহৎ হাতীর পিঠে এই দন্তাধারটি বসিয়ে তার উপরে ছত্রধারণ করেন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, এবং সেই হাতী যখন নগর-পরিক্রমায় যাত্রা করে তখন দুই দিকের সারবন্দী সালঙ্কর হাতীর দল নতজানু হয়ে বসে ওই দন্তাধারটির প্রতি শুঁড় তুলে অভিবাদন জানায়। সেই দৃশ্যের চারিদিকে লক্ষ লক্ষ সিংহলী দর্শক দাঁড়িয়ে উদার গম্ভীর স্বরে একটি ভারতীয় শব্দ তিনবার উচ্চারণ করে, 'সাধু, সাধু, সাধু!'

এটি লিখেছেন জনৈক ইংরেজ পর্যটক একশ বছর আগে।

কথায় কথায় স্বদেশের বা বিদেশের উপমা দেওয়াটা রুচিতে বাধে। কবে ঘি খেয়েছি আজ তার ঢেঁকুর তোলাটাও অশোভন। কাণ্ডিতে যে কয়টি ভাল আবাসিক হোটেল কাছে, তার মধ্যে এই 'কুইনস্' হোটেল শ্রেষ্ঠ। লণ্ডন বা প্যারিসে আমি মামুলি সস্তা হোটেলে কাটিয়েছি, কিন্তু বার্লিন হোটেল, মস্কোর ইউক্রেনা, মিউনিকের কেইজার, হামবুর্গের আটলাণ্টা ইত্যাদি—এসব

হোটেলের সঙ্গে দিল্লীর অশোকা বা জনপথ প্রায় মিলে যায়। এদেরই সমগোত্রীয় হল এই 'কুইনস্'। এ হোটেল প্রধানত বিদেশী পর্যটকদের জন্য, কারণ আমিও তো বিদেশী! হোক না কেন সিংহল ভারতের চিরকালের আত্মীয়, হোক না কেন ভারতের আদি সংস্কৃত ভাষা, ভারতীয় বৌদ্ধদর্শন, সভ্যতা, সংস্কার, ভারতীয় চিন্তাধারা, শিক্ষাপদ্ধতি, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা—সমস্তই সিংহলে প্রচলিত—তবু রাষ্ট্রীর বিচারে আমি বিদেশী পর্যটক মাত্র! আমার সমগ্র সত্ত্বা সিংহলকে একান্ত আত্মীয়ের মত পরম প্রীতিতে আলিঙ্গন করলেও আমি বিদেশী ছাড়া আর কিছু নই, আমার অন্য কোনও পরিচয় নেই। যা বলছিলুম। কুইনস্ হোটেলের নিচের তলায় একটি এক-বিছানাযুক্ত সুসজ্জিত ঘরে সম্পূর্ণ অনাহারে রাত কাটাবার দাম চল্লিশ টাকা। বর্তমান ভারতীয় বিনিময় মুদ্রায় ওটা পড়ে আন্দাজ একত্রিশ-বত্রিশ টাকা। কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছে দন্ত-মন্দিরের দেশে ঢুকে ওই হোটেলরই পঁচাত্তর নম্বর ঘরের সুখশয্যায় শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আমি নিজের দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছিলুম। শুনেছি দাঁতের যন্ত্রণার সঙ্গে প্রণয়-যন্ত্রণার মিল আছে অনেক; দুটোই অনুভূতি সাপেক্ষ। দুটোতেই কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না, বা দুটোরই যন্ত্রণা কারোকে বোঝানো যায় না, এবং দুটোতেই শুধু মুখ বুঁজে পড়ে থাকা, বোধহয় এই কারণেই শ্রীমতী একদা চোখে জল নিয়ে বলেছিলেন, সখি, কিছু জিজ্ঞেস করিসনে, শুধু আমাকে অনুভব করার চেষ্টা কর!

প্রণয় যন্ত্রণা মিলিয়ে যেতে লাগে একশ বছর, দাঁতের যন্ত্রণা মিলিয়ে যেতে লাগে হয়তো এক রাত্রি! পরদিন প্রভাতে উঠে দেখি সেই প্রাচীন পৃথিবী তেমনি কোমল সূর্যাভায় সুন্দর। ঘরের জানলার বাইরে ফুলবাগানের বড় বড় গাছে পাহাড়ি পাখিদের কলগুঞ্জন চলছে অবিশ্রান্ত, সেই বাগানের বাইরে বিশাল জলাশয়টির

ওপারে বনরাজিনীল পাহাড়ের অপূর্ব শোভা,—তার শীর্ষলোকের ওপর থেকে জ্যোতির্ময়ের সপ্তরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি যেন সমস্ত রাত ধরে নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, খুঁজতে খুঁজতে যেন ভোরের দিকে তোমাকে চিনতে পারলুম। অনাদি-কালের পৃথিবীর দিকে চেয়ে ভাবছিলুম, সেই তুমি। 'পথে-পথে তোরে খুঁজিনু, মনে মনে তোরে পূজিনু।' কাণ্ডিতে এখন পর্যটকদের মরশুম। প্রতি হোটেলে এখন ভিনদেশীর ভিড়। ইউরোপ আমেরিকার একই পোষাক, একই চাল-চলন, একই খাদ্য —সুতরাং কে কোন্ দেশের লোক এটি জানা যায় না। খাবার ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকা নিরাপদ নয়, পাছে আধুনিক মেয়েদের মিনি-স্কার্টের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লে শরীর খারাপ হয়! আমার সুবিধা ছিল এই যে, আগরওয়ালাকে এড়িয়ে এবার একা বেরোতে পেরেছিলুম।

যে-বিশাল দিঘীর স্বচ্ছ জলরাশি কাণ্ডির শ্রীবৃদ্ধি করেছে, সেটির চারিদিকেই অনতিউচ্চ সুশ্যামল পাহাড়ের প্রাচীর। কাণ্ডির অন্যতম প্রধান পরিচয় এই বিশাল জলাশয়, যাকে বেষ্টন করে রয়েছে এই সুন্দর নগরী। এককালে এটিও ছিল সিংহলের রাজধানী। একালে রাজধানী সরে গেছে বাহাত্তর মাইল দূরে কলম্বোয়। কেন না পার্বত্য প্রাচীরবেষ্টিত কাণ্ডিতে রাজধানী থাকা বর্তমান কালের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

এককালে কাণ্ডির রাজা ছিলেন বিমলধর্মস্যূরীয়, এবং তিনি বিবাহ করেন যে নারীকে তাঁর নাম ছিল ডোনা ক্যাথেরিনা। স্পষ্টত, ইনি ছিলেন বিদেশিনী। রাজা বিমলধর্মস্যূরীয় শুধু নয়, তাঁরও অনেক আগে থেকে কাণ্ডি—যার তৎকালীন নাম ছিল 'মহান্নুয়ারা'—একটি নিজস্ব উদার সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যেটি সমগ্র সিংহল থেকে ছিল পৃথক। সুবিধা ছিল কাণ্ডি তার আপন মনে

থেকে গিয়েছে পাহাড় দেশের অন্তঃপুরে তার পৃথক সত্ত্বা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এবং যেহেতু কাণ্ডিতে না আছে সমুদ্র, না জাহাজঘাটা, না আছে বন্দর—সেই হেতু কাণ্ডির প্রতি পর্তুগীজ, ওলন্দাজ বা ব্যবসায়ী ইংরাজ—ওদের কারও অতটা চোখে পড়েনি। পাশ্চাত্য মেজাজের ধাক্কা থেকে এই কারণে কাণ্ডি অনেকটা যেন আত্মরক্ষা করতে পেরেছে।

জনবহুল শহরের বস্তি-বাজার ঘুরে নিলুম। এ যেন ধর্মতলায় গায়ে চাঁদনি বাজারের অলিগলি, কিংবা দার্জিলিংয়ের চাঁদমারির আশপাশ। গায়ে গায়ে দোকান—মনিহারি, কাপড়-চোপড়, ডাক্তারখানা, চুল-ছাঁটাই, চা-বিস্কুট, মোটর মেরামতি, ফলের ষ্টল—সব মিলিয়ে ঘিঞ্জি।

দন্ত-মন্দির কাছেই, অনেকটা জায়গা নিয়ে রয়েছে। এ যেন কাণ্ডির ল্যাণ্ডমার্ক। যেদিক থেকেই দেখো, দন্ত-মন্দিরের চূড়া পাহাড়ের পটভূমিতে। সামনে ফুলের দোকান, মালা বিক্রি, বিভিন্ন আকর্ষণীয় সামগ্রীর বিকিকিনি। কিন্তু তবু এ সেই রেঙ্গুনের 'বড় ফয়া' নয়—তার বিশাল মহিমা অন্য প্রকার। এখানে ঢোকবার একটি ফটক, তার ডানদিকে সিঁড়ি—সিঁড়ি দিয়ে উঠলে দোতলার বড় বড় হল ঘর, সেখানে বিভিন্ন চিত্রের মেলা। এ যেন মস্ত মঠ, ভিতরে থাকে অনেক লোক, এখানে ওখানে বিধিনিষেধ। মূল মণিকোঠা আরও উপরে, সে দাঁতের মন্দির। সেটি প্রায়ই বন্ধ থাকে। লোকে দিয়ে যাচ্ছে গাঁদা ফুলের বা গোলাপের মালা, তার সঙ্গে হয়তো প্রণামী।

ওরই মধ্যে পরিভ্রমণ করলুম অনেকটা।

শহর-বাজারের কথা বাদ দিই। ও অনেক দেখা, অনেক জানা। তবু একথা মনে থাকবে, শহরের চেহারার ছাঁচটি ইউরোপীয়, ঠিক দেশীয় নয়। এরা বাঁচতে জানে, সুশ্রী জীবন চায়, নীতি শৃঙ্খলা মানে,

হুজুগ অপেক্ষা কাজকে বড় করে দেখে। ওর মধ্যেই পাই আর্ট এসোসিয়েশনের কেন্দ্র, সেখানে কলাশিল্প সাহিত্য কাব্য ইত্যাদি নিয়ে একটা বড় রকমের আসর তৈরি হয়ে রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন কুটিরশিল্পের মেলা দেখছিলুম।

গাড়ি নিয়ে নগরের একটু বাইরে আসবার সময় আরেকবার মহাবলী গঙ্গার সেতু পার হলুম। এখানে নদ ঘুরছে অর্ধচন্দ্রাকারে। কিন্তু এপার কিছু উঁচু। এ অঞ্চলের নাম 'পেরাডেনিয়া'। এখানকার সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ দুটি। একটি সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যটি রয়েল বোটানিক গার্ডেনস। এ বাগান বিরাট। এটি ছিল ছ'শো বছর আগেকার এক রাজার প্রমোদ কানন। এখন প্রায় চার শো পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে এ বাগান সৃষ্টি। গ্রীষ্ম এবং বর্ষাপ্রধান দেশে যত রকমের ফুল, ফল, সব্জি, বাদাম, লতা, গুল্ম, বৃক্ষ—যত রকমের ফলন এখানে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের মসলা—যেমন লঙ্কা হলুদ, গোলমরিচের লতা, ছোট এলাচের সযত্ন চাষ, লবঙ্গের গাছ, দালচিনি, জোয়ান, মৌরি, তামাক—কোন্‌টা নেই? এ বাগানে বড় বড় পাইপের সারি চলেছে, ওক দেখতে পাচ্ছি, যার পাতার একদিক দেখতে পাচ্ছি বিশাল চিড়, দেখতে পাচ্ছি একেকটি মহীরুহ। জলাশয়গুলিতে শ্বেতপদ্ম আর রক্তকমল, দেখতে পাচ্ছি বড় বড় ক্রীপার। চারিদিকে স্নিগ্ধ হরিৎবর্ণের সতেজ শোভা, তারই ফাঁকে ফাঁকে আসছে সূর্যকিরণ। মাঝে মাঝে চোখ পড়ছে মহাবলীগঙ্গার উপর দিয়ে ময়দানের ওপারে কাণ্ডির মাথার ওপর দিয়ে দিগন্তের দিকে। দেখতে পাচ্ছি উচ্চ সমতল 'টেবিল-পাহাড়',—যার ইংরেজি নাম 'বাইবেল রক।'

'পেরাডেনিয়ার' দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ এর শতগুণ শোভাবর্ধন করছে, যার তুলনা রাজস্থানের 'পিলানি' এবং কতক

পরিমাণ 'শান্তিনিকেতন'। পেরাডেনিয়ার পটভূমি পার্বত্য সৌন্দর্যশ্রী এবং অন্তহীন হরিৎক্ষেত্র। বন-বাগান, জলাশয়, গাছপালা এবং আগাগোড়া শান্ত ভাব। পিলানিও তাই, তবে চারিদিকের মরুভূমির দ্বারা বেষ্টিত। শান্তিনিকেতনের বাহ্যশ্রী আজও আনন্দদায়ক।

আগে বলেছি, সিংহলে লেখাপড়া জানা লোক শতকরা প্রায় বাহাত্তর জন। বোধহয় দক্ষিণ প্রাচ্যের কোনও দেশ শিক্ষায় এত অগ্রসর নয়। ভারতের অঙ্গরাজ্যে কেরালাই সিংহলের সমকক্ষ। সিংহলে প্রতি পাঁচটি ছাত্রের মধ্যে দু'টি মেয়ে-ছাত্র। পেরাডেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাদ দিলেও শুধু ডিগ্রি কোর্সেই আছে তিন হাজার ছাত্র এবং দু হাজার ছাত্রী। এই হিসাবে সিংহলের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সাড়ে বারো হাজারেরও বেশি।

হাঁটছি তো হাঁটছিই, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িগুলি আর শেষ হয় না। প্রতিটি বাড়ির কোলে বড় বড় বাগান, তৃণশোভাযুক্ত খেলার মাঠ, কোথাও বাঁশ বাগান, তারপর আবার ক্যানটিন, তারপর এল স্বচ্ছ সরোবরের প্রান্ত। মোট চুয়াল্লিশ খানা বৃহৎ অট্টালিকা যা ভারতের অন্য কোথাও সহসা চোখে পড়ে না।

আমার সময় হাতে ছিল কম। তবু আরেকটি দিনের মত আমায় কাণ্ডি শহরে থাকতে হোল। ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটির দরকার ছিল। মহাবলীগঙ্গার বনময় অংশে 'কাটুগাসতোতায়' হাতীরা কেমন করে স্নান করে, এটিও আমার দেখা দরকার। জানা দরকার ছিল গৃহস্থের জীবনযাত্রার চেহারা।

কতটুকু এই দেশ, কতই বা বড় রত্নদ্বীপ? কিন্তু এরাজ্যে এমন

এক ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে, যেটি ফুরোতে চায় না।

কাণ্ডি থেকে বেরিয়ে আবার সেই বনময় পথ ধরলুম। এখান থেকে আরেকবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 'দলদা মালিগাওয়ার' দন্ত-মন্দির, যেখানে আর কয়েক মাসের মধ্যেই আসবে ঝুলন-পূর্ণিমার উৎসব—যার নাম 'ইসালা-পেরাহেরা।' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাণ্ডির সুপ্রাচীন রাজপ্রসাদ, যেটি এখন যাদুঘরে পরিণত।

এই বনময় পথ ধরে যাবার সময় দূর থেকে কাণ্ডির মধ্যবর্তী সরোবরের ঠিক মাঝখানে ওই ছোট্ট দ্বীপস্থলটি একদা ছিল কাণ্ডির শেষ রাজার হারেম—যেখানে নূপুর নিক্কনের ঝঙ্কারে শোনা যেত এই পার্বত্য রাজ্যের বিশিষ্ট নৃত্যকলার ডাক।

পেরাহেরা বা উৎসব এখানে একটি নয়। প্রথমটির নাম 'বেশখ' বা বৈশাখী উৎসব। বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও পরিনির্বাণ—এই তিনটি নিয়ে 'বেশখ পেরাহেরা।' দ্বিতীয়টি 'পোসন'—বৌদ্ধধর্ম প্রথম যখন সিংহলে আসে। তৃতীয়টি 'কার্তিক পেরাহেরা'—অর্থাৎ মহাবিষ্ণু যেদিন ভারতীয় এক রাজাকে সংগ্রামে পরাস্ত করেন—এই উৎসব হয় শীতকালে। রয়ে গেল পিছনে 'লঙ্কা-তিলক বিহার', 'গদলা দেনিয়া বিহার', 'গঙ্গারাম বিহার'—প্রভৃতি একেকটি বৌদ্ধবিহার।

বোধহয় ইংরেজদের ভাল লেগেছিল এই পাঁচ-পাহাড়ি কাণ্ডি অঞ্চল, তাই তারা মহাবলীগঙ্গার আশেপাশে একেকটি পথের একটি করে নামকরণ করে গেছে। যথা—লেডী হর্টনস্ ড্রাইভ, লেডি ম্যাককালুম ড্রাইভ, লেডি ক্লেকস্ ড্রাইভ ইত্যাদি।

আমাদের গাড়ি আঁকাবাঁকা বনপথ ধরে চলে যাচ্ছল। একসময় পার হলুম এ স্রোতস্বিনী—বাঁ দিকে চলে গেলে সেই বুয়াররা এলিয়ার পথ। পাহাড়ের চূড়ার দিকে তেমনি ঘন নারিকেল কুঞ্জ আর কলা বন, তেমনি আম বন আর জাম বন,

তেমনি ঢালুপথের পাশে চা বাগান, কফিগাছের বন, কাজুবাদাম গাছের ঝোপ আর বন জঙ্গলের মধ্যে গোলমরিচের লতা দল। পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা 'সারাদিয়েল' আর 'উতুবনখণ্ড' আর 'কাদু-গান্নাওয়ার' পার্বত্য বনপথ! ছোট্ট 'হিঙ্গুলা' এবং আরও দুএকটি জনপথ পার হয়ে গেলুম। পার হয়ে যাচ্ছি সুপারি আর আনারসের বন, কলা বন, একটির পর একটি। এতটুকু জমি কোথাও পড়ে নেই, কোথাও অনুর্বর অঞ্চল চোখে পড়ে না—সর্বত্র প্রাকৃত সম্পদের ছড়াছড়ি। এই কারণেই এদেশের নাম স্বর্ণলঙ্কা। বনে বাগানে, মাঠে ময়দানে, পাহাড়ে কান্তারে একদিকে যেমন সোনার ভাণ্ডার অন্যদিকে সমুদ্র বেষ্টনীর সেই স্বর্ণ সৈকতের তীরে তীরে প্রবাল ও মুক্তার অনন্ত আকর।

ঘণ্টা তিনেক লাগল। আবার এসে পৌঁছলুম কলম্বোয়। তখন অপরাহ্ন কাল। এক পশলা বৃষ্টির পর এখন রোদ উঠেছে। আমি এসে নামলুম রামকৃষ্ণ মিশনের আন্তর্জাতিক অতিথিশালার বাগানে। কয়েকদিন অশ্রান্ত ভ্রমণের ফলে কিছু ক্লান্ত হয়েছিলুম।

কস্মিনকালে সিংহলে আমার একবর্ণ লেখা কেউ পড়েনি! সিংহলের একজন মাত্র ব্যক্তির সঙ্গেও আমার কখনও পরিচয় ছিল না। কিন্তু সিংহলে-এর অন্যান্য অংশ ভ্রমণ সেরে কলম্বোয় যখন ফিরে এলুম দেখি আমি রাতারাতি মস্ত খ্যাতিমান হয়ে উঠেছি! এখানকার কয়েকখানা সিংহলী ও তামিলি সংবাদপত্রে আমার কয়েকটি সাক্ষাৎকার, এবং সেগুলির সঙ্গে আমার ছবি ছাপা হয়েছে। মিশনের দোতলার ঘরটিতে এসে যখন চিৎপাত হয়ে পড়লুম, দেখি একরাশি সংবাদপত্র, সাময়িক কয়েকখানা বই, খানকয়েক নিমন্ত্রণ পত্র, ব্যক্তিগত কয়েকখানা চিঠি, পুস্তিকা ইত্যাদি

আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি যেন কতকটা উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করলুম।

তরুণ বয়সে কোথাও শুনেছি আমি নাকি সুপুরুষ! কিন্তু আমি যে এত কুপুরুষ, এই ছবিগুলো দেখে আরেকবার বিশ্বাস করলুম। দণ্ডকারণ্যে কারা বাস করত? কাদের সঙ্গে এসে রাজা রামচন্দ্র স্বর্ণলঙ্কা জয় করেছিলেন? আমার এমন ভৌতিক চেহারা আমি কি জানতাম? তারপরে ধরো সাক্ষাৎকার—ছোটবেলাকার বন্ধু পল্টু খুব থিয়েটার করত। কে যেন একদিন তাঁর 'দেবলাদেবী'র পার্ট দেখে বলেছিল, এমন করে হাত পা ছুঁড়ে সুর করে বলসি কেন?

পল্টু জবাব দিয়েছিল, কিছু কি ছাই মনে আছে, ফিলিংসের মাথায় কি বলতে কি বলেছি, সব ভুলে গেছি!

আমার এই সব সাক্ষাৎকারের ব্যাপারগুলোও তাই। একজন ঝানু রিপোর্টারের নানাবিধ প্রশ্নের জবাব ফিলিংসের মাথায় কি বলেছি, সেসব আবার ছাপতে হয়?

যাই হোক, কলকাঠি কোথা থেকে কারা নেড়েছে, সেগুলি অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু ফল হল এই, সিলোন বেতার-কেন্দ্র থেকে একটি আমন্ত্রণ এল, দশ মিনিটের জন্য আমাকে কিছু বলতে হবে।

দুএকদিনের জন্য যদি আমি কেষ্ট-বিষ্টু হয়েই থাকি তবে সেই বা মন্দ কি? কিন্তু এই বেতারকেন্দ্রের আমন্ত্রণে মনে পড়ে গেল একটি কথা। একদা কমিউনিস্টদের গুরুবাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে একাধিকার বেতারকেন্দ্র থেকে আমাকে বক্তৃতা ঘোষণা করতে হয়েছিল। কিন্তু অতিথি সেবক যারা তাঁদের আতিথেয়তার বা তাঁদের সমাজ ব্যবস্থার সুখ্যাতি করব না—এমন প্রতিশ্রুতি কি নিতে পেরেছিলুম?

এখানে সুবিধা এই আমি সিংহলের অতিথি নই, সেই কারণে তিলমাত্রও বাধ্য বাধকতা নেই! শুনেছি এঁরা কতকটা বামপন্থী। তা হবে। কিন্তু সিংহল আজও নাকি বৃটিশ ডোমিনিয়ন, এবং তাকে ইংরেজ রাজমুকুট মেনে চলতে হয়। তার জাতীয় পতাকা আছে, যেমন আছে কানাডার। তবু ভারতের মত গণতান্ত্রিক রিপাবলিক এখনও সে হয়নি। অতএব ওরা আমাকে দিয়ে ওদের সুখ্যাতি করিয়ে নেবে—এমন কথা মনে হয় না।

আমার বেতার ভাষণটি তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি মন্তব্য মাত্র।

সিংহলে আমার নবলব্ধ বন্ধু অধ্যাপক বিমলানন্দ এলেন। ইনি সিংহলের 'বিদ্যালঙ্কার' বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ ইতিহাসের অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কলম্বোর নিকটবর্তী কেলানিয়া উপসহরে অবস্থিত। ইনি ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পাঠাগারে গিয়ে ইতিহাস গবেষণা করেছেন। ভারতের বহু বরেণ্য মনীষীগণের সম্বন্ধে ইনি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম ইনি বারম্বার উল্লেখ করছিলেন। এঁর পাণ্ডিত্য, সৌজন্য এবং মিষ্ট আলাপচারণ আমার পক্ষে স্মরণীয়। ইনি এঁর গাড়িটি আমার ভ্রমণের জন্য মোতায়েন করেছিলেন।

আরও যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে 'সারসবীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমলশ্রী পেরেরা, টাইমস পত্রিকাগোষ্ঠির শ্রীযুত মহানার দৃশ্যনায়েকে,—ইনি 'লঙ্কাদ্বীপ'-এর সম্পাদক। এছাড়া সর্বসিংহলী সাংবাদিক সঙ্ঘের পক্ষের শ্রীযুক্ত প্রিয়সেন নিঃশঙ্ক এবং মার্ভিন-ডি-শিলভা। এঁদের গল্পগুজব, হাসি পরিহাস এবং মধুর ব্যবহার আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হয়েছিল। এরাই সকলে সিংহলের জনমতকে গঠন করেন। আমার পক্ষে আনন্দদায়ক আরেকটি বিষয়ও ছিল। আগে যেমন

অনুরাধাপুরায় পুলিশের কর্তাকে দেখেছি তরুণ বয়স্ক এবং হাস্যরসিক, কলম্বোর সরকারি মহলেও দেখছিলুম তেমনি অল্পবয়স্ক অফিসার। চুলপাকা, ঝানু, বাস্তুঘুঘু কূটনীতিক ও গদি-সচেতন সরকারি অফিসার ওদের কম। ডাইরেক্টর, মিনিস্টার, উপমন্ত্রী, সেক্রেটারি, ডেপুটি— এদের অধিকাংশই নব্যবয়স্ক এবং সদালাপী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের একটি সহজাত সম্ভ্রমবোধ লক্ষ্য করা যায়। আমার বিশ্বাস এই নতুনকালে ভারতের সঙ্গে সিংহলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মেলামেশার একান্ত দরকার। তামিল সম্প্রদায়কে ওরা হাড়ে হাড়ে জানে। কিন্তু তামিলকে বাদ দিয়ে যে বৃহত্তর ভারতবর্ষ, তার সঙ্গে ওদের পরিচয় কম।

এরপর একে একে এলেন 'সিলোন টাইমস'-এর রবীন্দ্র, এলেন 'নিউজ মিরর'-এর প্রতিনিধি, তারপর এলেন 'ভারত-সিংহল বান্ধব সমিতির' প্রবীণ বয়স্ক সেক্রেটারি—এবং আরেও কেউ কেউ। ভারত সম্বন্ধে, ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে, ভারতীয় শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে এঁদের আগ্রহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সর্বশেষ যেটি বাকি ছিল, সেটি হল সিংহলের সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বড় প্রতিষ্ঠান। নাম 'সাহিত্য মণ্ডলায়।' এঁদের সঙ্গে সিংহলের সাহিত্য প্রকাশকগণের এবং সাংস্কৃতিক সমিতিগুলির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। এঁরা সিংহল রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে পরামর্শাদি দিয়ে থাকেন, এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন, এঁদের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছিলুম। এঁরা বিশেষ একটি অধিবেশন ডেকেছিলেন।

'ধর্মশালা মাওয়াত্তা' নামক একটি রাজপথে সরকারি শিক্ষা-বিভাগের যেটি মস্ত বড় আপিস তারই নিচের তলাকার এক কক্ষে সেদিন গিয়ে হাজির হলুম। এখানকার ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত হেমশ্রী প্রেমবর্ধন ভিন্ন কয়েকজন খ্যাতনামা কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার,

সমালোচক, অধ্যাপক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যকর্মী ও সংস্কৃতিবিদ উপস্থিত ছিলেন। লেখকদের মধ্যে পরস্পর অনেকটা যেন চিনলুম 'জাতিভাই' হিসাবে। একজন অন্যজনের হাসি-কাশি জানে! এক ঔপন্যাসিক যে কোনও দেশের যে কোনও ভাষায় ঔপন্যাসিককে হাড়ে হাড়ে চেনে। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিনিময়ের প্রথম ভাষ্য হল উভয়পক্ষের সামাজিক আদান-প্রদান। মানুষকে চিনলেই সংস্কৃতিকে চেনা যাবে। নাচ গানে সিনেমা চিত্রে, শিল্প-প্রদর্শনীতে—একদেশ অন্যদেশকে জানে। আমেরিকান সিনেমা চিত্র দেখেছি শত শত, ইংরেজকে দেখেছি সাহিত্য আর সাম্রাজ্যবাদ,' জার্মানীকে দেখেছি নাৎসীর চেহারায়, সোভিয়েট ইউনিয়নকে দেখেছি তার বিপ্লবের গল্পে, চীনকে দেখেছি তার ওউ-কং, ফা-হিয়েন, হুয়েন সাঙ আর তার চারুকলা শিল্পে,—কিন্তু এসব দেখা সত্য হয়েছে কি? সিংহলী তামিল সম্প্রদায়—যারা আধিপত্য লাভ করেছিল দু হাজার বছর আগে, তারাই কি ভারতের শেষ পরিচয়? না, তা নয়। প্রত্যেক দেশের মানুষকে সামাজিক জীবনের মধ্যে জানতে হবে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক জানতে হবে, আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ ও নারী সমাজ এদের ভিতর দিয়ে জানতে হবে। সব দেশেই সাধারণ মানুষ আপন-আপন সত্য ও প্রকৃত চেহারা নিয়ে থাকে, দেশে-দেশে সেই সত্যবান ও সত্যবতীর সংস্পর্শে আশা দরকার। সংস্কৃতির সেইটিই বড় দায়িত্ব।

জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ সূত্রেই ভাব-বিনিময়। কয়েকজন ভাষণ দিলেন। শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করলেন ডাইরেক্টর এবং সেই কাগজটি দিলেন আমার হাতে। আমাকে অবশ্য এর জবাব দিতে হল একটি ভাষণে। কিন্তু কী বললুম, অথবা আমার ভিতর থেকে আমার মুখ দিয়ে অন্য কেউ বলল, সেসব আর আমার মনে নেই।

সর্বশেষে একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন এই 'সিলোন একাডেমি অফ লেটার্স অর্থাৎ এই 'সাহিত্য মণ্ডলায়।' এই দুর্লভ গ্রন্থের নাম 'জানকীহরণম্'। বইখানি জগৎপ্রসিদ্ধ, এবং এর মূল লেখক, কুমারদাস। কুমারদাস বহু শতাব্দী আগে এই রামায়ণ গ্রন্থ মূল ও আদি সংস্কৃত থেকে মালাবারি হরফে ছন্দোবদ্ধ ভাবে রচনা করেন। এর আদি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় লণ্ডনে। লণ্ডন থেকে আসে মাদ্রাজে এই শতকের প্রারম্ভে। সেই পাণ্ডুলিপি থেকে এই গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে আনা হয় এবং এই বই সিংহল সরকারের শিক্ষাবিভাগের পক্ষ থেকে সিংহলের দুজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ডক্টর পরাণবিতান ও ডক্টর গোড়কুম্বুরা কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে সিংহলেই প্রকাশিত হয় সেদিন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এর অতি মূল্যবান ভূমিকাটি পড়লে একদিকে যেমন জানা যায় এ গ্রন্থ জগৎপ্রসিদ্ধ, তেমনি অন্যদিকে আনা যায় সিংহল ও ভারতের মধ্যে কী নিবিড় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক, এবং সেই সম্পর্ক কত যুগ ও যুগান্তর কালের। গ্রন্থের প্রাথমিক পরিচয়পর্বে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতের নাম আছে।

অতঃপর আমি বিদায় নিলুম সকলের কাছে। এদের কারোকে দেখে মনে হয়নি এঁরা ভিনদেশী বা আমি পরদেশী। আমাদের একই চেহারা, একই মনপ্রাণ। ভারতাত্মার এঁরা চিরকালের পরমাত্মীয়।

পরদিন অপরাহ্নে এসে পেঁ ছিলুম 'তাপ্রবেন' হোটেলের লাউঞ্জে। কলম্বোর বা সিংহলের অপর একটি প্রাচীন নাম 'তাপ্রবেন।' মিঃ অজয় গুপ্ত সমাদরে আমাকে নিয়ে এলেন, এবং এখান থেকেই বিদায় নিলেন। যথাসময়ে গিয়ে পেঁ ছিলুম কাটুনায়েকে বিমানঘাঁটিতে। এখানে যে ধরণের খানাতল্লাসী চলে বিদেশীদের মালপত্রের উপর, সেটি অনেক সময় কিছু সম্মানহানিকর হয়ে ওঠে। দুজন গুজরাটি

মহিলার খানাতল্লাসীর চেহারা দেখে আমি একটু দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম।

আমার পালা যথাসময়ে এল। পাশপোর্টখানা এবং আমার একটি হ্যাণ্ডব্যাগ ওঁদের জিম্মায় দিলুম। ওঁরা আগে পরীক্ষা করলেন পাসপোর্টখানা। 'নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে না যেন করি অপমান—'। আমার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে অফিসার হাসি মুখে নমস্কার জানিয়ে পাসপোর্ট ফেরত দিলেন, ওঁকে এমবার্কেশন কার্ডকানা এনে দাও—এই টিকেট।

বুঝতে দেরি হল না, সংবাদপত্রগুলি কিছু কাজে দিয়েছিল।

আকাশের মহাশূন্যে উড়ে গেলুম সন্ধ্যার লগ্নে। নারিকেলকুঞ্জ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বিমান চক্রাকারে ঘুরল ভারত মহাসাগরে। আদি অগ্নি-দেবতার যিনি বিশ্ব-প্রতীক, সেই রক্তিম সূর্যগোলক, ডুবে যাচ্ছে মহাসাগরের মহাগ্রাসের মধ্যে। সামনে একটা ধূসর রাত্রির ছায়া পূর্ব মহাকাশকে আচ্ছন্ন করছিল। নিচের ভূগোলক শুধু অস্পষ্ট জল, উপরে শুধু অনন্ত শূন্যের চেতনা। বিমান ভেসে চলল উত্তর দিগন্তে।

নিলগিরি

যাচ্ছিলুম নিলগিরির দিকে নিজের মনে। ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলুম—আর্যাবর্তকে দুহাত বাড়িয়ে দাক্ষিণাত্য কখনও অভ্যর্থনা জানিয়েছে, এ সংবাদটি পুরনো ইতিহাসে বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতে আর্যঋষিদের উত্তরাধিকারীরা যখন রাজ্যপাট নিয়ে বসে গিয়েছিল, তখন বিন্ধগিরির দক্ষিণের অধিবাসীরা মাথা তুলে মাঝে মাঝে ওদেরকে বাঁকা কটাক্ষে দেখে নিত। সব মুনিঋষির জন্মকর্ম উত্তব ভারতে, দক্ষিণে একজনও ঋষি নেই। অমন যে বশিষ্ঠ মুনি, যিনি মোট বারোটি আশ্রম বানিয়েছিলেন, হিমালয়ের উত্তর সীমান্ত পাহারা দেবার জন্য, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাণ্ডব ভীম ও অর্জুন যাঁরা সেই হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে নিজেদের রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা কখনও দাক্ষিনাত্যের দিকে পা বাড়াননি। কেবলমাত্র পূর্বযুগে শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণপথে গিয়ে বিপুল পরিমাণ বানর-সেনা রিক্রুট করেছিলেন। তাও অনেকটা যেন ব্যক্তিগত কারণে। আর্যক্ষত্রিয় মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে দক্ষিণের রক্ষকুলের ব্রাহ্মণরাজ রাবণ। শুধু সুন্দরী স্ত্রীর জন্যই গণ্ডগোল পাকালো।

সুতরাং দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে মিল হয়নি আর্যাবর্তের কোনও কালে। মিল হয়নি রামায়ণে, মিল হয়নি মহাভারতে। পুরানের কোথায় যেন রয়েছে প্রগতিবাদী অগস্তমুনি বিন্ধগিরি পেরিয়ে বোধ হয় আর্য্যবর্তের পক্ষ থেকে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন দৌত্যগিরি করতে কিন্তু তারপর থেকে লোকটার আর কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। আমার ধারণা, লোকটা ছিল আমীষভক্ষী, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের 'ইদ্‌লি আর দোষা' খেতে খেতে পেটের ব্যামোয় ভুগে মরে

পথে-ঘাটে। আমাদের সুনীতিবাবু যিনি খাদ্যরসিক, তিনি বল্লেন, দাক্ষিণাত্যের মতো উৎকৃষ্ট সুখাদ্য ভূ-ভারতে খুবই কম। তা হবে। তাঁর রসনা শুধু অপ্রাদেশিকই নয়, আন্তর্জাতিকও বটে।

আমি যাচ্ছিলুম নিলগিরির দিকে। এই সব কথা তোলাপাড়া করছিলুম মনে-মনে। সুপরিকল্পিতভাবে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের মিল ঘটাবার চেষ্টা ইতিহাসে যথেষ্ট পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যায় না। গৌতম বুদ্ধের কালের আগে দাক্ষিণাত্যের খবর কেউ রাখেনি। মৌর্যযুগে বোধ হয় অজন্তার কাজ আরম্ভ হয়,—তারপর থেকে দেড় হাজার বছরের মধ্যে কি হল কে জানে। শুধু অস্টম ও নবম শতাব্দীর— প্রারম্ভে দেখি নবীন বয়স্ক সন্ন্যাসী আচার্য শঙ্কর অধ্যাত্মবন্ধনে বেঁধেছেন—আসমুদ্রহিমাচল. এবং সেটি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার এই একই বাঁধনে বেঁধে দেন, এক হাজার বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দ, প্রায় একই বয়সে—এবং সেও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। প্রকৃত সন্ন্যাসী ভারতে আজও সমাদৃত।

এর মধ্যে ইংরেজ কাজ করে গেছে যেটি মূল্যবান। তার নিজের ভাষায় বাঁধবার চেষ্টা করে গেছে দক্ষিণকে উত্তরের সঙ্গে। আজ আমরা সেটাকেই ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি। দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের না আছে ভাষার মিল, না লিপির—ফলে মনের, মুখের ও সমাজের—কোনও মিলই হয়নি। শুধু মিল ঘটেছে হিন্দুয়ানিতে। দাক্ষিণাত্য যেমন জিদ ধরে তার অতি কঠোর হিন্দুপণা বজায় রেখেছে, উত্তর ভারতের অধিবাসীরাও ঠিক তেমনি জিদ ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংহতি নিয়ে আর্যাবর্তকে পৃথক করে রেখেছে। তবু ইংরেজের এই কাজটুকু নষ্ট করে দেবার জন্য একদল হিন্দিবাদী উত্তরভারতীয় কুলাঙ্গার দক্ষিণের ওপর চাপাতে গিয়েছিল হিন্দি, কিন্তু দক্ষিণীরা জবাব দেয় ওদের মুখের মতন। তারা বলল, ভাষা নিয়ে আমাদের ওপর বেশি উৎপাত করতে এসো না, সাবধান, যদি এ পাড়ায় এসে বেশি বাড়াবড়ি করো তাহলে আমরাও পাকিস্তানের মতো একটা দ্রাবিড়িস্তান বানিয়ে

নেবো ! ভাষার ব্যাপারে ওরা ভারতীয় কংগ্রেসকেও বিশ্বাস করেনি, সেজন্য ওরা দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘামের শক্ত ঘাঁটি বানিয়ে তুলেছে। কংগ্রেস এখন কাঁদছে।

উপত্যকা পথের ভিতর দিয়ে মোটর বাসে যাচ্ছিলুম। আমি মোটর বাস ধরেছি কেরালার 'কজিকোড' বা কালিকট থেকে, যাচ্ছি সোজা পূর্বপথে—তামিলনাড়ুতে গিয়ে পৌঁছবো। পথের অধিকাংশটা কেরালায় পড়ে, অল্পাংশ তামিলনাড়ুতে। কেরালার আগাগোড়া পার্বত্য উপত্যকা এবং এটির অপর নাম মালাবার উপকূল। পশ্চিমে সমুদ্র অর্থাৎ আরব সাগর এবং পূর্বাঞ্চল পার্বত্য। এর ফলে কেরালায় মধুর বসন্তকাল অব্যাহত থাকে। ঐ বসন্তকালের মধ্যেই আসে বর্ষা, এবং বৃষ্টি-বাদলের কোনও নির্দিষ্ট ঋতু নেই। মেঘের টুকরো দেখা গেল সমুদ্রে, সেই মেঘ জোড়ো হল উপত্যকায়,—তারপর খাণিকক্ষণ নামল ধরঝরিয়ে বৃষ্টি।

ছায়াঢাকা পথ। নারিকেল বনের অনন্ত শোভার তলায়-তলায় মাইলের পর মাইল আম-কাঁঠালের বাগান, প্রতি কাঁঠালের গাছে গোলমরিচের লতা ঘন আচ্ছাদনে প্রতিটি গাছ ঘিরে রেখেছে। কলাবন আর পেঁপেগাছের বন মাইলের পর মাইল। কোথাও ফাঁক নেই, পতিত জমি নেই, শুকনো মাঠ নেই—এ যেন বৃক্ষচ্ছায়ায় ঢাকা এক উপত্যকাদেশ। বেশ লাগছিল পথের তুদিকের পুষ্পসমারোহ—গোলাপের জটলায়, রক্তিম জবার আভায় এবং বহুবর্ণাঢ্য বোগনভিলায়—যেন পুষ্পবীথিকা রচনা করে রেখেছে !

'তামারাশেরি' নামক একটি জনপদ অতিক্রম করে যাচ্ছি। দক্ষিণের নামগুলি আমাদের কানে অপরিচিত ঠেকে, এবং সেজন্য শ্রুতিসুখকরও নয়। যেমন কুদাপ্পা, কান্দালোর, আলোয়াইয়া—ইত্যাদি। নামগুলো যদি সংস্কৃত ঘেঁষা হয়, তবে সুবোধ্য হয়ে ওঠে। সুন্দর, মসৃণ এবং অসমতল পথ দিয়ে বন-বাগান-উপবন-তপোবন

পেরিয়ে আমরা ছুটতে ছুটতে এসে পেঁ ৗছলুম 'বাইনাদ' নামক একটি লোকবহুল ছোট শহরে, এবং সেখান থেকে গিয়ে দাঁড়ালুম আরেকটি গ্রামের দোকান পসারির সামনে, যার নাম হল 'চুন্দেল'। থাক আপাতত চুন্দেল আমাদের সময় কম। গাড়ি ছুটতে ছুটতে এল 'চেরামবাদি'। এতক্ষণ পরে আমরা এলুম দুই রাজ্যের অন্যতম সন্ধিস্থলে। এখানে উভয় রাজ্যের চেক-পোষ্ট ও পাহারা দেখতে পাচ্ছি। একদিকে কেরালা, অন্যদিকে তামিলনাড়ু। যেমন সর্বত্র, তেমনি এখানেও। চলতি কথায় যেটাকে বলা হয় 'চোরাই চালান' এখানে তার একটি ঘাঁটি। কেরালায় দেশী মদ্য বা বিদেশী হুইস্কি প্রচুর, কিন্তু তামিলনাড়ুর কোথাও মদ নেই। সেজন্য তামিল ভদ্রলোকরা শুষ্ককণ্ঠে কেরালার দিকে ঈর্ষান্বিত চোখে চেয়ে থাকেন। এই 'চেরামবাদি' তাঁদের সেই শুষ্ককণ্ঠকে সিক্ত করে।

এক সময় আমরা এচে পেঁ ৗছলুম গুড়ালুর' নামক একটি ক্ষুদ্র জনপদে। এখান থেকে পথ দুভাগ হয়ে গেল। একটি গেল সোজা উত্তরে মহীশূর নগরের দিকে, অন্যটি গিয়ে পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। আমরা এবার উপত্যকার সমতল ভূভাগ পেরিয়ে নিলগিরির সানুদেশে এসে পেঁ ৗছলুম। পশ্চিমঘাটের দীর্ঘলম্বিত যে গিরিশ্রেণী উত্তর থেকে নেমে এসেছে দক্ষিণে মালাবার উপকূলে, সেই গিরি-শ্রেণীর সঙ্গে নীলগিরির কোথায় এবং কতটুকু যোগ—সেটি বিচার্য বিষয়। পূর্বঘাটের পাহাড়গুলি ঠিক শ্রেণীবদ্ধ নয়,—ওদের ছেদ এবং অবকাশ দেখলে মনে হয় ওগুলো যেন হঠাৎ উঠেছে গজিয়ে ভুঁই-ফোঁড়ের মতো। কিন্তু ওই ছেদ এবং অবকাশগুলির ভিতর দিয়ে পশ্চিমের নদীরা যখন এসে বঙ্গোপসাগরে মেলে তাহাদের মোহানা-গুলি প্রাকৃতিক শোভাকে সমৃদ্ধি করে। পূর্বঘাটের উপকূলের নাম 'কোরোমণ্ডল'—এটি বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি।

আমাদের সুন্দর জনবিরল পথ উঠে গেছে সুপ্রসিদ্ধ 'মুতুমালাই' অরণ্যের দিকে। অরণ্য এক এক স্থলে নিবিড় এবং ঘন অন্ধকারে

আচ্ছন্ন। ওরই ভিতর দিয়ে নেমে আসছে 'পেরিয়ার' নদী, যার প্রাচীন নাম হল 'পূর্ণা'—এ অঞ্চলে তার স্রোতনিরোধক একটি বিশাল জলাধার সম্প্রতি নির্মিত হচ্ছে, এবং এখান থেকেই বিভিন্ন প্রণালীপথে পেরিয়ার নদী বয়ে গেছে। এই মুত্নমালাইয়ের গহন অরণ্য গিয়ে মিলেছে মহীশূরের বিশাল বনভূমিতে,—যেখানকার চন্দনবনে বন্য হস্তীরা যখন তখন গা ঘষে যায়।

অতঃপর চড়াই আরম্ভ। পায়ে হাঁটলে এই চড়াই খুবই কষ্টকর। বলাই বাহুল্য, আমরা উপর দিকে চড়াই পার হয়ে আমাদের লক্ষ্য 'উতাকামান্দের' দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। নীলগিরির রাজধানী 'উতাকামান্দ' নগরী বসে রয়েছেন প্রায় শিখরলোকে, আমরা দেখতে দেখতে তাঁর পদপ্রান্তে এসে পৌঁছিলুম। আর বেশি বাকি নেই। অরণ্যে অরণ্যে অবেলার আলো এরই মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে। উঠছি সমতল থেকে উচ্চশিখরে, যেন পৃথিবী থেকে শূন্যলোকে! এবার যেন ঠাণ্ডায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমাদের গাড়ি প্রচণ্ড গর্জনে শেষ চড়াইটুকু পার হচ্ছিল। মুত্নমালাইয়ের ঘন বনপথ ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল। পেরিয়ারের আশেপাশে ঝরোকাগুলির জলের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। উতাকামান্দ ওরফে 'উটি' শহর দেখিতে পাওয়া যাচ্ছিল। একশ' কুড়ি মাইল পথ পেরিয়ে এলুম।

আজকাল 'গভর্নমেণ্ট টুরিষ্ট লজ' একটির পর একটি গড়ে উঠেছে ভারতের প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য নগরগুলিতে। এগুলি সাধারণ ভারতীয়দের জন্য কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। কেননা এ ধরনের লজে একজনমাত্র ব্যক্তির ভদ্রজীবন যাপনের পক্ষে দৈনিক খরচ পড়ে কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা। তবে স্থান বিশেষে নগদ মূল্যের কিছু তারতম্য ঘটে। শীতপ্রধান অঞ্চলে দাম খুবই বেশি। মেঝেতে কার্পেট, বিছানায় গদি-চাদর-কম্বল, স্নানাগারে গরম জলের গেজিয়ার, চাকর-

বাকরের সার্ভিস, হাতের কাছে ক্যান্টিন, ঘরের ভিতরকার মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় আসবাবসজ্জা,—এগুলির জন্যই দাম বাড়ে! এই সব হোটেল ও লজে পর্যটকদের দিয়ে সর্বাপেক্ষা অসাধুতা, তঞ্চকতা, ও ডাকাতি চলে আগ্রায়,—যেখানে জন-কয়েক বাঙ্গালী ডাকাতও ওৎ পেতে পূজার সময় থেকে বসে থাকে! এ ব্যাপারটায় সর্বাপেক্ষা সাধুতা ও সৌজন্য রক্ষা করে সিমলা পাহাড়ের বাঙ্গালী পরিচালিত কালিবাড়ি। ওখানে ফাঁকি এবং প্রতারণা নেই। কিন্তু আধুনিক ভারতে সাধুতার ঠাঁই বোধ হয় কম, এবং সম্ভবত সেই কারণেই সম্প্রতি শুনছি সিমলার শৈলশহর মাটির তলায় নেমে যেতে বসেছে! ওখানে বসবাস আর নিরাপদ নয়।

উতাকামান্দে আমি সরকারি টুরিষ্ট লজে একটি ঘর নিয়েছিলুম। এটি একটি ছোট টিলা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এর অট্টালিকাও যেমন বিরাট, ব্যবস্থাপনাও তেমনি রুচিশীল। তিনদিকে বড় বড় দেওদার চিড় এবং ওকগাছের ভিড়। এই বৃহৎ উদ্যানবাটি শহর থেকে দু'পা পিছন দিকে। এর সামগ্রিক চেহারা অনেকটা ইউরোপীয়। আমার ধারণা, এখন যাঁরা ওখানে সাময়িক ভাবে বাসা বেঁধে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমি ছাড়া সকলেই বিত্তবান! শুনলুম বছরে এক-আধজন বাঙ্গালী এসে এখানে এক আধ-দিনের জন্য ঘুরে যান। আমি সেই আধজনের মধ্যে। তবে কিনা আমার কথা আলাদা। আমি ডেয়ে-পিঁপড়ের মতো আপাতত কামড়িয়ে বসে রইলুম। নীলগিরি খুঁটিয়ে শেষ না করে এ-কেন্দ্র থেকে নড়ব না।

'উটি' সাত হাজার দু'শ কুড়ি ফুট উঁচু। দূরের পাহাড় দেখছি প্রায় নয় হাজার। কিন্তু এই সাত হাজার দু'শ ফুট উপরে এসে দেখি, এটি একটি মনোরম উপত্যকা—যেটি প্রায় চতুর্দিকে পাহাড়ের দ্বারায় বেষ্টিত। আবহাওয়া সমস্ত বছরে প্রায় একইরকম। অর্থাৎ ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রির মধ্যেই থাকে। সর্বদাই যেন স্নিগ্ধ-মধুর।

আরব সমুদ্রের পশ্চিমা বাতাস নিত্য এসে পাহাড়ের শৈত্যকে মিলিয়ে দেয় বসন্ত সমীরণে! 'উটির' সীজন এখনও আরম্ভ হয়নি।

বহু প্রাচীনকালে নীলগিরির আদিবাসীদের নাম ছিল 'ভোদা'। তারা এক-ছিদ্রযুক্ত ঝোপড়ার মধ্যে বাস করত, সেগুলো যেন বাবুই পাখির বাসা। একটি ছিদ্রই ছিল সেটির প্রবেশ পথ,—এবং সেগুলির নাম ছিল 'মান্দ।' এই উপত্যকার এককালে নাম ছিল 'উতাকালমান্দু,' পরে হল 'বুত্তাসামান্দ,' তারপর 'হুতাকামুন্দ,'— অতঃপর ১৬০২ খৃষ্টাব্দে জনৈক পর্তুগীজ ধর্মযাজক ঘুরতে ঘুরতে এই পাহাড়ে উঠে আসেন। পাশ্চাত্যের অধিবাসী এখানে সেই প্রথম। এরই দু'শ বছর পরে আসেন এক ইংরেজ, নাম মিঃ বুকানম। তারপরে আসেন জনৈক ম্যাকমেহন, সুলিভান প্রভৃতি দেখতে দেখতে এখানে ইংরেজের গ্রীষ্ম নিবাস-গড়ে ওঠে। কবে যেন এখানকার উচ্চতম শিখর থেকে নেমে এসেছিল তুষারস্রোত। সেই থেকে সেই পাহাড়টির নাম হয়েছে 'স্নোডাউন।' সেই থেকে অর্থাৎ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে উতাকামান্দ বিলিতি মেজাজে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ইংরেজের যাঁরা তৎকালীন খয়ের খাঁ রাজা মহারাজার গোষ্ঠী, তাঁরাও একে একে এসে এক একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে বসে যান। ভারতের বড় বড় পার্বত্য শহরগুলির ইতিহাস প্রায় এই একই রকমের।

আমি যেন এসে পড়েছি উত্তর-পূর্ব ভারতের এক গোয়েন্দা— ঠিক সেই রকম ছোঁক ছোঁক ক'রে সর্বত্র খবর নিয়ে বেড়াচ্ছি। এ পাহাড়ে তিন শ্রেণীর লোককেই দেখা যাচ্ছে এবং তিন পক্ষেরই স্বার্থ বেশ কায়েমী! তারা হল তামিলী, মহীশূরী এবং কেরেলি।

একটির পর একটি পাহাড় যেন সাজানো রয়েছে চতুর্দিকে, এবং কালক্রমে তারা একেকটি নামও পেয়ে গেছে। যেমন দেদাবেত্তা, এলক, চার্চ, ফার্ণ ও কেয়ার্ণ। কেয়ার্ণের পাইন সমাকীর্ণ অরণ্য শিলংয়ের বীডন ফলসকে মনে করিয়ে দেয়। এ যেন বনরাজিনীলা!

কেয়ার্ণ পাহাড়ের নিরিবিলি অঞ্চল ইংরেজ রাজপুরুষদের এককালে লীলাক্ষেত্র ছিল। চলে যেত তা'রা ১৫ মাইল দূরের একটি মনোরম উপত্যকায়, এবং সেখানকার নাম দিয়েছিল 'এমারাল্ড ভ্যালি।' আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে নীলগিরি বন আপন অনগ্ন বন্য সৌন্দর্যকে অবারিত করে দেয়। এখানে দুটি অঞ্চল নীলগিরির পক্ষে প্রসিদ্ধ। একটি হ'ল 'মুকের্তি' অন্যটি 'পাইকারা'। এখানে একদিকে যেমন বিরাট জলাধারের শোভা, অন্যগিকে তেমনি গিরি-নদীর নূপুর-নৃত্য, এবং সূর্যকরোজ্জ্বল সরোবরের উপরে নীলকান্ত গগনে প্রতিবিম্ব সারাদিন ধরে চেয়ে থাকলেও দেখা ফুরোয় না!

এই প্রসঙ্গে দু' একটি অন্য রকমের সংবাদ জানালে বাধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না॥ 'উটির' চারদিকে অন্তত দু'শ চায়ের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে এবং এখান থেকেই নীলগিরির চায়ের চাষ আরম্ভ হয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। অপর একটি সংবাদ হ'ল নীলগিরিতে 'সিনকোনা' চারার চাষ। আমার ধারণা, ভারতের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং মহকুমার এই সিনকোনার চাষ ছিল অদ্বিতীয় কিন্তু 'উটিতে' এসে জানলুম, এখানেও সিনকোনা চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখান থেকে মাত্র ২২ মাইল দূরে মহীশূর রোডের ধারে যে অঞ্চলটির নাম 'সাত্নভাত্তম', সেখানে একশ' বছরেরও আগে ইংরেজ কার-বারীরা ধরে আনত দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত চীনা আসামীদেরকে। তারা এখানে শ্রমিক ছিল অনেকটা ক্রীতদাসের মতো। রাত্রের দিকে সেই চীনাদেরকে একটি খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ রাখা হত। সেই সুবৃহৎ তালা ও চাবি আজও রয়েছে সেখানকার কারখানায়। যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব এই, সমগ্র ভারতে উৎপন্ন কুইনিনের চারভাগের তিন ভাগ কালিম্পং থেকেই আসে।

এই শহরের বয়স দেড়শ' বছর—এটি সহজেই ধ'রে নেওয়া যায়। সেই কালে হয়েছে ডাকঘর আর হাসপাতাল, এবং এই কালের মধ্যেই বাজার হাট বসেছে। বাজারের অংশটার নাম চেয়ারিং

ক্রশ।' ওই দিকেই রেল স্টেশন ও বাস ষ্ট্যাণ্ড। আমাদের এদিকটা অভিজাত পল্লী, অর্থাৎ যেন 'চৌরঙ্গী' পাড়া—এদিকের সবটাই ফ্যাশনেবল। এই উঁচুতে বসে নিচের দিকে দেখা যায় মস্ত এক সরোবর, চারদিকের বৃষ্টির জল নেমে আসে ওখানে। ওটা নিচের দিক, জনকোলাহলে মুখর। ওখান থেকে ভাড়াটে ঘোড়া নিয়ে যার যেদিকে খুশি ভ্রমণে বেরিয়ে যায়। পাহাড়ে, বনে, উপত্যকায় ঝর্ণার তলায়—নিরিবিলি নিভৃতে স্বপ্নের জাল বোনা! নিতান্ত প্রয়োজনে আমি চলে যেতুম চেয়ারিং ক্রশ ছাড়িয়ে।

একদিন সকালে 'উটি' থেকে আরেকবার বেরিয়ে পড়লুম। আগের দিন বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ সকালে পরিষ্কার আকাশ মধুর রৌদ্র দেখা দিয়েছে। বাংলোর বাগানের নিচেই রাজপথ। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম চেয়ারিং ক্রশে। কোনও পার্বত্য শহরে যান-বাহন থাকে না,—শুধু দূর পাল্লার জন্য মোটর বাস চলে। সর্বত্র এই একই নিয়ম। তবে আজকাল ট্যাক্সির যুগ,—যেমন দার্জিলিংয়ে এখানকার সুযোগ সুবিধা। নচেৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাঁটো। যদি না হাঁটো, তবে ঘোড়া নাও। কিন্তু শাড়িপরা মেয়েদের পক্ষে ঘোড়ায় চড়ায় অসুবিধা দেখে অনেক পাহাড়ি শহুরের পথে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছে! না, আমি দেখিনি!

'ফিঙ্গার পোষ্ট' অর্থাৎ হাতের পাঁচ আঙ্গুলের মতো পাঁচটি পথ পাঁচটি দিকে চলে গেছে। একটি পথ গেছে 'মার্লেমন্দ' জলাধারের দিকে, যেখান থেকে 'উটির' পানীয় জল আনা হয়। একটি পথের নাম 'গভর্ণরস শোলা'—নামেই বুঝতে পারা যায় রাজপুরুষদের ছায়াবীথিকা। একটি পথ গিয়েছে সিগুরঘাটের দিকে সেখানকার 'কালহাত্তির জলপ্রপাত নামছে বন্য গিরি-লোকের তলায় তিন হাজার ফুট নিচে।

আমার অত বন্য শোভায় আর প্রয়োজন নেই। ও অনেক

হয়েছে। এখন ফুলের চেয়ে ফল, এবং ফলের চেয়ে তার শাস। সুতরাং আমার কাছে দেখে বেড়ানোটাই বড়। যাই হোক 'ফিঙ্গার পোষ্টের' কাছাকছি এসে দেখি. সামনের মাঠে বেশ একটা মেলা বসেছে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ নাচতে আরম্ভ করেছে। এমন তাদের সব ডুগ-ডুগি আর বাদ্যযন্ত্র এবং কণ্ঠ-সঙ্গীতের এমন এক ধ্বনি হয় ওদের আওয়াজের মধ্যে যে ভাষা, তার আগাগোড়াই আমার কাছে দুর্বোধ্য। সব মিলিয়ে মস্ত দল। কিন্তু ওরা নাকি সবাই আদিবাসী এক ভদ্রলোক ইংরেজিতে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। ওদের মধ্যে নাকি রয়েছে তোদা, বাদগা, কোটা, কুরুম্বা, ইরুলা প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়। জলপাইগুড়ির যেমন টোটোরা সংখ্যায় কম, তেমনি এদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হয়ত ৪০০, কোনটার১২০০, কেনোটা বা একবারেই কম। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে এদের সংখ্যা নিচের দিকেই যাচ্ছে! এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল বাদগা সম্প্রদায়, তাদের জনসংখ্যা মোট ৩৪ হাজার।

ওই নাচ গানের মধ্যেই এক সময় আমি কিছুদূর এগিয়ে কোটগিরির মোটর বাস ধরলুম। এ বাস যাবে নীলগিরির গহন লোকে।

মোটর বাসের ড্রাইভার সমগ্র উতাকামান্দ শহরটি একবার পরিক্রমা ক'রে নিল, যদি আরো যাত্রী পাওয়া যায়। উঠলো দু' চারজন সন্দেহ নেই। কেউ যাবে কুন্নুর, কেউ ওয়েলিংটন, কতক যাবে বান্দিশোলা, আবার কেউ বা কোটগিরি। নীলগিরি পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে মোটর বাসের সংখ্যা অনেক, সেজন্য সম্ভবত নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগির ব্যবস্থা আছে। যেমন বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে রয়েছে এক প্রকার বোঝাপড়া। এয়ার ইণ্ডিয়াতে বুক করা হ'ল, কিন্তু যাবার সময় হয়ত গেলুম রুশ আমেরিকান কিংবা বৃটিশ বিমানে। ওদিক থেকেও তাই যার যেমন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা!

বটানিক্যাল গার্ডেনস দেখা হল না, ওটায় অনেকটা যেন অরুচি

তরুণ বয়সে বটানি ছিল আমার পাঠ্য বিষয়, কিন্তু এই বিদ্যা আমার পক্ষে সয়নি। সাহিত্যে বটানিকে সমাদৃত করে যান বিভূতি বাঁড়ুয্যে।

আমার গাড়ি নামছিল নিচের দিকে। 'উটি' শহরই সর্বাপেক্ষা উঁচুতে। অন্য পাহাড় আরও উঁচু হতে পারে, কিন্তু সেখানে নগর বসাবার মতো উপত্যকা নেই। এই যেমন মুসৌরীর পাশে আছে আরেকটি উপত্যকা, সেজন্য 'লাণ্ডুর' নামক জনপদ তৈরী হয়েছে। নৈনিতাল রাণীক্ষেত, পিথোরাগড় ডালহাউসি, বা দার্জিলিং—এদের সে সুবিধা নেই।

আমরা নিচের দিকেই নামছিলুম। এদিকটা 'উটির' বিপরীত। অর্থাৎ পূর্বদিকের প্রাচীর অতিক্রম করে গাড়িখানা যেন সোজাই উৎরাইতে নেমে যাচ্ছে। আমরা মাইলদশেক পেরিয়ে এসে দেখলাম আর একটি চমৎকার চক্রাকার উপত্যকা শহর,—ইংরেজরা এর নাম রেখেছে 'ওয়েলিংটন'।

আমাদের সঙ্গে আড়ালে আব-ডালে রেলপথটিও নেমে এসেছে 'উটি' থেকে। এই রেলপথও অর্ধচন্দ্রকারে ঘুরে এসেছে একটি ছোট্ট পার্বত্য ষ্টেশনে। যাত্রীবোগিগুলি ইদানীং আর জনবহুল নেই কেননা মোটরবাস হাতের কাছে থাকে সেজন্য বাসে চলাচল করাই একালে সুবিধা। রেললাইনের পাশে পাহাড়তলীতে একটি মস্ত খৃষ্টানদের সমাধিভূমি। সেগুলি অধিকাংশই ইংরেজদের। ১৮১২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মৃত্যু কারোকে ক্ষমা করেনি! হিন্দুদের সুবিধ এই তারা মৃতদেহ একটু তাড়াতাড়ি ক'রেই পঞ্চভূতে মিলিয়ে দেয়! এদিক দিয়ে হিন্দুরা খুব প্র্যাকটিক্যাল!

ওয়েলিংটন ছোট শহর, কিন্তু প্রচুর তার জনসংখ্যা। দোকানে বাজারে পথেঘাটে—প্রচুর লোক। বাসষ্ট্যাণ্ডের পাশে একটি বড় ঝরণা নেমেছে। আশেপাশে সর্বত্র ঘন লোকবসতি। এই ওয়েলিংটনের পুরনো নাম ছিল 'ম্যাকতালা'। এটি ছিল ইংরেজের গোরাছাউনি। কিন্তু এখানকার বড় বড় ব্যারাকগুলিতে সামরিক অফিসাররা

মেয়েছেলে সঙ্গে এনে খেলাধুলো এবং আমোদ-অহ্লাদ করে যেত। এখন ইংরেজ নেই, তবে নাচগানের, অনুষ্ঠানাদি এখনও চলে। প্রকৃতপক্ষে ওয়েলিংটন আর কুন্নুর একপ্রকার গায়ে গায়ে—মাইল-খানেকের মধ্যে। দুই মিলিয়ে একপ্রকার যৌথশহর। ওই যেমন বললুম মুসৌরি থেকে লাণ্ডুর। যেমন হিমালয়ের মধ্যে চম্পাবত আর লোহাঘাট। হরিদ্বারের সঙ্গে যেমন কনখল। কিন্তু ওয়েলিংটন অপেক্ষা কুন্নুর সুদৃশ্য। এখানে গুটিপোকার চাষ একটি দ্রষ্টব্য বস্তু এবং এরই সঙ্গে সিম্‌স্ গার্ডেন এবং একটি জলপ্রপাত পর্যটকদের পক্ষে মস্ত আকর্ষণ। এও একটি জনবহুল অধিত্যকাপ্রদেশ এবং মস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র।

আমাদের মোটরবাস আবার ছেড়ে গেল তার আঁকাবাকা চক্রাকার পথে। এবার চড়াই ধীরে ধীরে উঠছে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। চারিদিকে দিগন্তজোড়া গিরিশ্রেণী। কোথায় এক উত্তুঙ্গ চূড়া নেই। কোথাও নিচে খাদ, কোথাও প্রজাপতি পতঙ্গভরা উপত্যকা, কোথাও গিরিনির্ঝরিণী একই আওয়াজ তুলে চলে যাচ্ছে, আবার কোথাও বা গিরিখাদের নিচের দিকে অন্তহীন পুষ্পসমারোহের আশেপাশে কাব্যের ব্যঞ্জনা উচ্ছ্বসিত হচ্ছে!

এটির নাম 'কাইতি' উপত্যকা, এরই একদিকে দেখছি একটি 'অরফানেজ'—অনাথ শিশুপ্রতিষ্ঠান। এগুলি ইংরেজের কুকীর্তি। যেখানে যায় ইংরেজ, সেখানে রেখে আসে একদল অবৈধ সন্তান। ১৯ শতাব্দিতে বাঙ্গলায় গজিয়ে উঠেছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌স্ এবং আজও কালিম্পঙের চূড়ায় রয়েছে 'গ্রেহামস্ হোমস্।' বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে আমেরিকান সৈন্যরা ইংল্যাণ্ড ও জাপানে পাঁচ লক্ষেরও বেশি অবজাত শিশু রেখে আসে! পরবর্তীকালে এই সন্তানরাই বিট্‌লস্, বিট্‌নিক্ ইত্যাদি হয়ে উঠেছিল কিনা, সেটি গবেষণার বিষয়। বাঙ্গলাদেশে বিশ্বযুদ্ধের কালে ইয়াঙ্কি সেনাদলের নোংরা আচরণের কাহিনী অনেকেরই মনে আছে। বিশেষ ক'রে

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের কালে। যাইহোক্, এই পথে 'আরাবানকাড়ু' নামক একটি অঞ্চলে ইংরেজরা একটি বারুদের কারখানা তৈরি করে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। সেটি আজও আছে। কুন্নুরের চারিদিকে এক অতি মনোরম পার্বত্য অঞ্চল। এখানকার পাস্তুর ইনষ্টিট্যুট সেণ্ট জোসেফ, টাইগার হিল্, ওয়াকার হিল্, রুকল্যাণ্ডস্ রোড এবং কাত্তেরি দাব্—এগুলি বিশেষভাবে উপভোগ্য। আমাদের গাড়ি 'বান্দিশোলা' নামক এক ক্ষুদ্র জনপদ পেরিয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে আমাদের গাড়ি ছায়ানিবিড় এবং বনময় পথ ধরে কোটগিরির দিকে অগ্রসর হ'ল। এদিকটা যেন নীলগিরির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শোভা ও সৌন্দর্যে অপরূপ। একদিকে বনময় পাহাড়, অন্যদিকে উপত্যকার আশেপাশে ছবির মতো একেকটি গ্রাম। যেখানে-সেখানে চায়ের ক্ষেত। এরা যেন চিরকাল পাহাড়ের গায়ে পোকার মত লেগে রয়েছে। এরা যুগযুগান্ত কালের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন!

কোটগিরির ছোট্ট বাজারের কাছে এসে গাড়ি থামল। কয়েকটি মাত্র দোকান, এগুলিতেই নিত্যপ্রয়োজনের সামগ্রী। এখান থেকে তিনটি পথ গেছে তিনদিকে। আমাদেরটি চতুর্থ। স্বাধীনতার আগে এই ক্ষুদ্র জনপদটি ছিল ক্ষুদ্রতর। এখন কিছু বেড়েছে জনবসতির সংখ্যা। বাজারের চেহারার ঈষৎ উন্নতি হয়েছে, ওষুধের দোকান খুলেছে, মোটর-মেরামতি দোকান দেখা যাচ্ছে, এবং কইম্বাটোর ও মহীশূর থেকে এটা-ওটা মালপত্র আমদানি হচ্ছে।

কোটগিরিকে ইংরেজিতে বলা হয়, 'ছোট একটি মুক্তা নীলগিরির কানে দুলছে।' সন্দেহ নেই, এখানকার জলহাওয়াটি ভাল। প্রোটিন্ খাদ্য পাওয়া যায় বৈকি। দুধ, মাংস, ফল, মাখন, সব্জি—এগুলি যদি সু-হজম হয়, এবং যকৃতের ক্রিয়াদি যদি নিয়মিত থাকে, তবে মুক্তার দুল' হীরের দুল হয়ে ওঠে। নভেম্বরের হরিদ্বার অত অপরূপ কেন মনে হয়? কারণ ওই যকৃতের ক্রিয়া ওখানে সরল ও সুন্দর।

এখানে একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী সপরিবারে বাস করেন, তিনি

আমার সুপরিচিত। তিনি হলেন অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস শঙ্করপ্রসাদ মৈত্র। তিনি যখন ঢাকায় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন আমি তখন তাঁর আতিথ্য নিয়েছিলুম দিন তিনেকের জন্য। তাঁর স্ত্রী ও তাঁর মধুর আপ্যায়ন, সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহার আমি ভুলিনি। তাঁরই ঠিকানা আমার সঙ্গে ছিল। ওই ঠিকানাটি আমি দেখালুম স্থানীয় পঞ্চায়েৎ আপিসে। ওঁরা খুশী হয়ে আমার জন্য একখানা ট্যাক্সি স্থির ক'রে দিলেন।

পথ বেশিদূর নয়, হয়ত বা মাইল দেড়েকের মধ্যে। ডানদিকে পাহাড়, বাঁদিকে গিরিখাদ। অতি নিভৃত এবং জনবিরল পার্বত্য পরিবেশ। গাড়ি এসে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল একটি বৃক্ষপুষ্পাচ্ছন্ন প্রবেশপথের প্রান্তটিতে। এর আগে মৈত্র মহাশয়কে টেলিফোনে ধরেছিলুম! সুতরাং চালুপথ দিয়ে উঠে তাঁর বাগানে যখন ঢুকলুম তিনি এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। বহু বছর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। চারদিকে মস্ত তাঁর বাগান, এবং পূর্বমুখা তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা। অবসরগ্রহণের পর তিনি এই অতি বৃহৎ বাগান, চাষের উপযুক্ত পার্বত্য কৃষিক্ষেত্র এবং এই অট্টালিকা ক্রয় করেছেন। সংসারে আছেন তাঁর দুই কন্যা ও স্ত্রী। একটি কন্যা বিবাহিত, অন্যটি গ্রাজুয়েট।

মিসেস্ মৈত্রের অকৃপণ আতিথেয়তা আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়েছিল। ঢাকার বাড়িতে একদিন রাত্রে আমার সিগারেট ফুরিয়ে যায়,—উনি আমাকে এক টিন ষ্টেট একস্‌প্রেস উপহার দেন। আতিথেয়তার সেই তদারক এবং পরিচালনা আমাদের সেদিনকার প্রতিনিধি দলের কেউ ভোলেনি।

বাইরে ঘরটি মনোরমভাবে সুসজ্জিত। সেখানে বসে আমরা বিভিন্ন গল্পে মেতে উঠেছিলুম। আজ এখানে আমার মধ্যাহ্নভোজ প্রস্তুত হচ্ছে।

বললুম কলকাতা থেকে এতদূরে এলেন? এ যে প্রায় দু'হাজার মাইল!

শঙ্করবাবু বললেন, সব মিলিয়েই ত' ভারত, তারই মধ্যে রয়েছি ! কেন মনে করব দূর ? এ ত' একই জননীর কোল।

খুব ভাল লেগেছিল তাঁর সেদিনের জবাব। কলকাতা যদি তাঁর হয়, নীলগিরিও তাঁর, কাশ্মীর-গুজরাট-আসাম-কন্যাকুমারীও তাঁর ! তাঁর চোখ বাঙ্গালীর নয়, ভারতীয়ের। তাঁর চেহারা দীর্ঘকায় কিন্তু স্থূল নয়। এখনও তিনি প্রচুর কর্মঠ। এখানে কয়েক একর জমিতে তিনি চায়ের চাষ করেন। ফল ও সব্জির বাগান। অন্যান্য ফলনও যথেষ্ট। তিনি বাড়িটির নামকরণ করেছেন 'দক্ষিণপথ।' তাঁর নিজের একখানি গাড়ি আছে। আমি অনেককাল থেকে জানতুম, তিনি ইংরেজ আমলের একজন বিশিষ্ট আই-সি-এস হয়েও ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধে খুবই অনুরাগসম্পন্ন। পরমহংস, বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী প্রভৃতির সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় আমার জানা ছিল।

আহারাদির কালে তাঁদের তরুণী কন্যাটি আমাদের সঙ্গে বসেছিল। মেয়েটি ইংরেজ মেয়ের মতো রক্তিম শ্বেতবর্ণা। মিসেস মৈত্রও একজন সুশ্রী মহিলা। তিনি হাসিমুখে বললেন, ওই মেয়েটিকে একদিন দাক্ষিণাত্যের একটি মন্দিরে পাণ্ডারা ঢুকতে দেয়নি তাদের বিশ্বাস, ইংরেজের মেয়ে শাড়ি প'রে বেআইনীভাবে মন্দিরে ঢুকতে চাইছে। অবশেষে বহু চেষ্টাচরিত্রের পর কলেজের প্রিন্সিপালের সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে মেয়েটিকে প্রমাণ করতে হয়, সে এক আনুষ্ঠানিক হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। তার পিতামাতা উভয়েই বর্ণহিন্দু।

এই ঘটনাটির বিবরণ শুনে সেদিন খুবই কৌতুকবোধ করেছিলুম।

অপরাহ্ণের দিকে আনন্দের এই স্মৃতিটুকু নিয়ে বিদায় নিলাম। আমি 'উটিতে' ফিরবো, সেখানে কাজ আছে। শঙ্করবাবু গাড়িতে আমাকে এনে মোটরবাসে তুলে দিয়ে বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন।

তিরুমালা

অন্ধ্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কিছুদিন থেকে ঘোরাঘুরি করছিলুম। ভ্রমণে পা আর মন দুই হাঁটে। সঙ্গী থাকলে বেরিয়ে বেড়ানো চলে, গল্প-গুজবে সময় কাটে, কিন্তু সঠিক ভ্রমণ মার খায়। বন-জঙ্গলের দিকে যখন শিকারীদের সঙ্গী হই, তখন সত্যিই উদ্দীপনা পাই।

কিন্তু প্রকৃত ভ্রমণে আমি একা। আমার মধ্যে আমি—সেই আমার সঙ্গী। সে পরিব্রজ্যার সহচর।

পূর্বঘাট পর্বতমালার এক এক স্থলে এক একটি নাম। কিন্তু অত নামে আমার দরকার নেই। আমার ভ্রমণ ছিল সেই অঞ্চলটায় যেখানে ভেলিকোণ্ডা আর পালকোণ্ডা,—এই দুই পাহাড়ের শ্রেণী দক্ষিণে এসে একত্র মিলেছে। 'কোণ্ডা' নামে পাহাড় ব'লে রাখা ভাল। এর আগে পেরিয়ে এসেছি নাগরী পাহাড়ের ধার—যেটার পূর্বসীমান্তে এক বিশাল হ্রদ—অনেকটা চিল্কার মতো। কিন্তু যতই দেখি, আর্যাবর্তের পাহাড়ের সেই সজীবতা ও সজলতা নেই কোথাও এদিকে। অমন যে রুক্ষ আরাবল্লি তারও কোথাও কোথাও শ্যামলের শোভা ও সরসতা আছে—যেমন ধরো নাথদ্বারের ওদিকটায়। কিন্তু এদিকে কিছু নেই। কাঁটালতা আর পাথরের স্তূপ,—গুল্মলতার আশেপাশে বড়জোর দুচারটে গাছপালা—বাদবাকি সবটাই পাথরের জটলা। চারিদিকে যেন রুক্ষস্বভাব বর্বরতার পরিচয়।

আমি ওই সুবিশাল হ্রদকে ডানদিকে রেখে উত্তর-পশ্চিমে 'কাল-হস্তী' নামক এক জনপদে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। এটা চিত্তুর জেলার উত্তরাংশ। অদূরে পাহাড়ের ঠিক নিচে 'স্বর্ণমুখী' নদী, এবং তারই

প্রান্তে একটি শিবমন্দির। পটভূমির সঙ্গে মানিয়ে গেছে আর দুটি মন্দির দুটি পাহাড়ের চূড়ায়।

নদী যেন ভুলেই গিয়েছিলুম। সামান্য জলের ধারা কোথাও কোথাও যে নেই তা নয়। কিন্তু নদীর জন্ম হবে কোথা থেকে? উত্তর ভারতের সেই উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণী কই, সেই চিরতুষারের সাম্রাজ্য কোথায়? সুতরাং এ ভূভাগে এখান-ওখান থেকে পাঁচ-সাত-দশটা ক্ষীণধারা মিলে মোটামুটি একটি নদী তৈরী হয়।

রৌদ্র প্রখরতর হচ্ছে দাক্ষিণাত্যে। শীত বলে কিছু নেই দক্ষিণাপথে। অক্টোবর-নভেম্বরে গুমোটের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে বর্ষা, ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে ইলেক্‌ট্রিক পাখা ছাড়া কেউ হোটেলের ঘর নেয় না। ফেব্রুয়ারী-মার্চ গরম—তারপর আসে গরম জলের বর্ষা। দাক্ষিণাত্যের বর্ষায় সারাদিন এবং দিনের-পর-দিন ও রাত বর্ষায় হাবুডুবু খেলেও ঠাণ্ডার অসুখ করে না।

কালহস্তী থেকে রেনিগুণ্টা। এও একটি বড় জনপদ। এদিকে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়ে। কিন্তু মন্দ কি, হোক না রৌদ্র প্রখর, দেখতে দেখতে আরও বাইশ চব্বিশ মাইল চলে এলুম। কথা বলছিনে,—কা'র সঙ্গেই বা বলব। দেশ গাঁ ত' মোটামুটি জানি, যানবাহন ত ধরাই থাকে,—সুতরাং এ অনেকটা নিজের মনেই ভেসে যাওয়া। চোখ থাকে বাইরে, কথা বলি নিজের সঙ্গে।

এককালে তীর্থস্থানকে উপলক্ষ্য ক'রে ভ্রমণে বেরোবার রীতি প্রচলিত ছিল। সেই কারণে ভ্রমণ মানেই ছিল তীর্থভ্রমণ। সে রীতি এখন নেই। আমাদের শিশুকালে ভাটপাড়ার সেই বৃদ্ধা গুরুমাকে দেখতুম, প্রায় প্রতিবছর তিনি বেরিয়ে পড়তেন তীর্থভ্রমণে। কলকাতার বহু স্থলে তাঁর শিষ্য ও শিষ্যা ছিল। বাইরে গিয়েও তাঁর শিষ্যসেবক জুটে যেত। কখনও শ্রীক্ষেত্র, কখনও কামাখ্যা, কখনও

চন্দ্রনাথ, কখনও বক্কেশ্বর, কখনও বা গয়া-কাশী-বৃন্দাবন। পায়ে হাঁটতেন বেশি, কখনও নৌকা,—নৌকায় যেতেন যখন-তখন এবং নৌকা ছাড়া তিনি কাশী যাননি,—নৈলে বদ্যিনাথ, পাগলা কালী, তারকেশ্বর—এরা ছিল সব হাতের পাঁচ। আমরা তাঁকে দেখতুম তাঁর আনাগোনার পথে। তিনি ঝুলি-পুঁটলি খুলে বসলে আমি সেগুলোর মধ্যে একপ্রকার বিদেশ-বিভূঁয়ের বন্য গন্ধ পেতুম। সেই গন্ধ পাওয়া যেত ঘরছাড়া কি একটা অজানা পথের সন্ধান। গুরুমার বয়স যখন সত্তর রেরিয়ে গেছে আমি তখন নিতান্তই নাবালক শিশু। তাঁর চওড়া হাতের কব্জি চওড়া মুখের চোয়ালের হাড় এবং বড় বড় দুখানা পা। তাঁর ঝোলার মধ্যে থাকত মালাজপের পুঁটলি, একরাশি কড়ি, চন্দন কাঠ, কবিরাজি বড়ি, রুদ্রাক্ষের মালা, তিলক মাটি, পাটকরা কাঁথা, টিনের কৌটায় মিশি ও মাজন। আরও কত কি। তামার ঘটি, পাথরবাটি ও ছোট কালো পাথরের রেকাবি, ছোট্ট একখানা পাটকরা বঁটি। দুটো পুঁটলির সব মিলিয়ে ওজন সের পনেরো। আমি তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতুম। তাঁর গায়ের রং গঙ্গাবর্ণ, চোখ কালো নয়—যেন নীলের ছায়া। তাঁর মিষ্টমধুর স্নেহ কারোকে কাছে টানত না—যেন নির্বিকার ও নির্মোহ। সে যেন ছিল মিশনারি সাহেবের ভালোবাসা।

পুরনো বালিধসা ঘরে রেড়ির তেলের আলো যখন জ্বলত মিট-মিটে, গুরুমার মুখে তাঁর সর্বশেষ ভ্রমণকাহিনী সবাই মিলে শুনতুম। কবে তাঁকে কেউটে সাপ তাড়া করেছিল, কবে কোথায় তিনি পড়ে-ছিলেন খ্যাপা শিয়ালের হাতে, গঙ্গাসাগরের জঙ্গলে কবে মাঝরাত্রে কাছাকাছি বাঘ ডেকে যাচ্ছিল, পদ্মা পার হতে গিয়ে মাঝনদীতে কবে ঝড়-তুফান উঠেছিল কালো আকাশের মেঘের ডাকে—সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে আমার রক্তের মধ্যে বন্ধন শৃঙ্খলের ঝঙ্কার ঝনঝন করত। এই দরিদ্র ঘরের সজ্জার ভিতর থেকে যেন উৎপীড়িত

আমার আত্মা ছুটে চলে যেত অরণ্যে পর্বতে সমুদ্রে নদীপথে এবং বিদেশের বিভিন্ন আকাশপথে। মনে হ'ত জীবনের প্রথম পাঠ যেন তুলে নিচ্ছি!'

দেখতে দেখতে এসে পেঁ ৗছিলুম তিরুপতি শহরে।

এতবড় একটা শহর সৃষ্টি হয়েছে দাতব্যের উপর—এটি ঔৎসুক্য আনে। এটি সর্বপ্রকারে নির্মাণ করেছেন 'দবস্থানম্ ট্রাস্ট্। অন্ধ্র-প্রদেশ সরকার এ শহরে বিশেষ হাত দেননি। অবাক হতে হয় দেব-স্থানমের ক্রিয়াকলাপ দেখে। ইস্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং, বিভিন্ন অর্থকরী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, পৌরকর্মাদি, মেয়েদের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র, বড় বড় হাসপাতাল ও প্রসূতি সদন, কৃষি কলেজ,—যা কিছু দেব-স্থানমের। বিশাল এক একটা কৃষিক্ষেত্র, বড় বড় গোশালা, শাক শব্জির বড় বড় খামার, বড় বড় ধানের কল,—চারিদিকে সমাজকল্যাণ কর্মের বিপুল আয়োজন। সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলেছে। মোটর বাস রুটটি পর্যন্ত দেবস্থানমের! কয়েক লক্ষ কর্মী দেবস্থানমের বেতনভোগী। এদেশে হরতাল, ইউনিয়ন, ঘেরাও, দলগত বিরোধ, ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, সর্বনাশা সমাজবিদ্বেষ —এসব এখনও কিছু নেই। অদূরে গোবিন্দরাজস্বামীর বিরাট প্রস্তর মন্দির, তারই উপযুক্ত প্রবেশপথের গোপুরম। আর কিছুদূর এগিয়ে গেলে লক্ষ্মীর মন্দির।

প্রখর রৌদ্র এবং আমার হাতের বোঝা আমাকে স্থির থাকতে দিল না। এখন ফাল্গুন মাস, কিন্তু এ যেন বাঙ্গালার জ্যৈষ্ঠের দুপুর। আমি গিয়ে উঠলুম তিরুমালার বাসে। তিরুমালা বা মালাই এখান থেকে পাহাড়ের পথে মাত্র চোদ্দ মাইল। অর্থাৎ তিরুপতির বাজারের উপরে পাহাড়পথ নেমে এসেছে। একেবারে হাতের কাছে।

ওইটুকু পথ, কিন্তু প্রত্যেক গাড়ির উপরে কন্ট্রোল ব্যবস্থা

নিখুঁত। কেউ দাঁড়িয়ে যাবে না, কেউ পাদানিতে ঝুলবে না। যত গুলি সীট, ঠিক ততগুলি যাত্রী। হৃষিকেশ থেকে যেমন নরেন্দ্র নগরের পথ, যেমন আবু পাহাড় থেকে আবু রোড, যেমন সিমলা থেকে নারাকাণ্ডা। ওইটুকু পথ যেমন প্রশস্ত, তেমন পিচঢালা মসৃণ ও চিক্কন। হেঁটে গেলে জিগ্‌জ্যাগ পথে মাইল ছয়েক চড়াইপথ, বাসে চোদ্দ মাইল। কতটুকুই বা উঁচু, হয়ত বা হাজার চারেক ফুট। চারিদিকের পাহাড়ে কেমন যেন প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশ। নিচের দিকটায় সামান্য সবুজের শোভা, একটু উপর দিকে উঠলেই স্বভাবের রুক্ষতা। মাঝে মাঝে কাঁটাগুল্মের ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝিরঝিরে জলের ধারা—যেগুলো এক এক স্থলে জলের 'পুল' তৈরি করেছে। কোথাও নিভৃত বীথিকায় ডালপালা ছেয়ে কুঞ্জবনের আস্বাদ এনেছে।

দেখতে দেখতে উপরদিকের বাতাস কতকটা শীতল হয়ে এল। মোটরবাস যেখানে এসে দাঁড়াল, সেটি পাহাড়ের কোলে এক অতি বিস্তীর্ণ উপত্যকা। দূর দূরান্তর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। এটি এক প্রসিদ্ধ মন্দিরকেন্দ্রিক শহর। একদিকে সারি সারি আধুনিক ধরনের একতলা পাকাবাড়ি—প্রায় একই ডিজাইনে তৈরী। অপর দিকে বিশাল প্রাসাদোপম কয়েকটি অট্টালিকা। এরপর থেকে এক একটি বাগানবাড়ি। সামনে কয়েকটি দোকান ও হোটেল। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে মস্ত জনবহুল আপিস। এখানে মাত্র তিন টাকা জমা দিলে তোমাকে একরাত্রির জন্য একটি শোবার ঘর আসবাবপত্র সমেত,—একটি রান্নাঘর ও একটি বড় স্নানাগার—ওরা দিয়ে যাবে। তার সঙ্গে ইলেকট্রিক আলো থাকবে। এত স্বল্পমূল্যে ইদানীং ভারতের অন্য কোথাও এ ধরণের ঘর মিলবে মনে হয় না। শুধু শয়নকক্ষ নয়, একটি বসবার ঘরও তার সংলগ্ন। চারিদিকে আবৃত অবকাশ।

এ সব ঘরবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করে চৌকিদারের দল তাদের ওপর খোঁজখবর রাখে কর্মচারিরা। কর্মচারিদের কাজের হিসাব নেন ম্যানেজার। ম্যানেজারদের মাথার উপর কর্তৃপক্ষ। ঘুষ নেই, লাল ফিতা নেই। উমেদারি বা ঘোঁটপাকানো নেই। পথের ওপারে বড় বড় অট্টালিকাগুলিকে বলা হয় 'চৌউলাট্রি' অর্থাৎ উর্দু ভাষায় সরাইখানা,—তীর্থ-যাত্রীর বিরামস্থল। বড় বড় তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয়। একালের সুবিধার জন্য করা হয়েছে অতন্ত একরাত্রি। যারা কাজ-কারবারি, ব্যবসায়ী. চাকুরে, ছাত্র বা অধ্যাপক, রাজনীতিক চাঁদা আদায়ে যারা পারদর্শী, যারা পিকনিক পার্টি, যারা হুজুগে—তারা আসে কয়েকঘণ্টার জন্যে। এরপরে রইল তীর্থযাত্রী—তারা হাজারে হাজারে এবং কাতারে কাতারে। এখানকার যিনি উপাস্য দেবতা, যিনি তিরুমালার অধিপতি, তিনি সর্বপালক বিষ্ণু, তিনি এখানে হয়েছেন ভেঙ্কটেশ্বরস্বামী। 'স্বামী' শব্দটি দাক্ষিণাত্যে খুবই পরিচিত। যেমন রামেশ্বরমে শ্রীরামনাথ-স্বামী, কাঞ্চিতে যেমন শ্রীবরদারাজস্বামী, ত্রিবন্দরমে যেমন শ্রীপদ্ম-নাভস্বামী। প্রাচীন ইতিহাসের তিনজন মহাপুরুষ—তিনজনই। ধর্মদর্শনের প্রচারক—তাঁরা সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মনোজগতের অধিপতি। তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং সর্বপ্রধান হলেন আচার্য শঙ্কর, দ্বিতীয় আচার্য রামানুজ, তৃতীয় আচার্য মাধব। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ। সেই একই কথা সর্বত্র। ভিন্ন নামে সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, অন্নপূর্ণা।

নিচের দিকে তিরুপতি, পাহাড়ের পরে তিরুমালাই। ত্রি বা তিরু সর্বত্র। তিরুচি, তিরুচেন্দুর, ত্রিচূড়, তিরুনেলভেলি, ত্রিবন্দরম্, তিরুবাদি, তিরুবান্নামালাই,—আরো অনেক আছে, মনে পড়ছে না। আমাদের সঙ্গে এদের পরিচয় কম। ভাষা ও লোকাচারে আমরা বিছিন্ন—সেজন্য সামাজিক লেন-দেন ঘটেনি, বৈবাহিক সম্পর্ক

সম্ভব হয়নি। ইংরেজ আমলের আগে কেউ দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখেনি, চার-চারটে অতি সমৃদ্ধ ভাষার খোঁজ করেনি কেউ। তারা হল তামিল আর তেলেগু, কানাড়ি আর মালেয়ালম। কানাড়ি আর মালেয়ালমের বিপুল সাহিত্যের ভাণ্ডার কেরালা ও মহীশূর ভ্রমণকালে যদি না দেখে আসতুম আমার ভ্রমণ থাকত অপূর্ণ। তামিল আর তেলেগু কাছাকাছি বাস করে। তাদের ঐশ্বর্য এখন সর্বভারতে অনেকটা পরিচিত।

এটুকু পরিচয় ঘটত না, যদি ইংরেজেরা 'কালচারাল কংকোয়েস্ট' না করত। ইংরেজি ভাষা আছে বলেই দক্ষিণকে কাছে পেয়েছি। রাজস্থান গুজরাট পাঞ্জাব কাশ্মীর উত্তরপ্রদেশ আসাম—এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকত দাক্ষিণাত্যের থেকে—ইংরেজি যদি না থাকত! ওই ইংরেজি ধরেই দাক্ষিণাত্য যুক্ত থাকতে চায় বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে। উত্তর ভারত হিন্দি ঢোকাতে গিয়েছিল দাক্ষিণাত্যে, পশ্চিম পাকিস্তান উর্দু ঢোকাতে গিয়েছিল পূর্ববঙ্গে—ফলাফল পরিণত হয়েছিল হলাহলে।

কপালের ঘাম শুকিয়েছিল পাহাড়ি উপত্যকার ঠাণ্ডা হাওয়ায়। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। আমি একা থাকতে চাই, কেউ না দোসর থাকে আমার। একা থাকলেই দেখতে পাই সর্বত্র আমি। পথে পাথরে জনপদে লোকযাত্রায় জনতার প্রতি ব্যক্তির মধ্যে সেই আমি। ঘরে বাইরে নালা নর্দমায় মন্দিরে বিগ্রহে—সেই একা আমি। আমার দোসর নেই!

চারিদিকে দেখছি মুণ্ডিতমস্তক। প্রাদেশিক ভাষায় যাকে বলে নেড়া-নেড়ি। 'প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাপী যথাতথা।' এ যেন সেই দক্ষিণের প্রয়াগ। কার্তিকী পূর্ণিমায় কাশীর দশাশ্বমেধ-ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখো, অগণ্য স্নানার্থীর নেড়া মাথা! বুঝতে বাকি থাকে না ওরা প্রয়াগ ফেরৎ। হুগলীতে তারকেশ্বরের চুল, বর্ধমানে

পাগলা কালীর বালা, চিত্রকুট পাহাড়ের পায়স, কামাখ্যার নোয়া, শ্রীক্ষেত্রের লালছড়ি, বঙিনাথের বিরখণ্ডি, গয়ার গদাধরের পাদপদ্মে ফল, ঘোষপাড়ার সতীমায়ের সিঁদুর—এবং আরও আছে, ক'টাই বা মনে রাখি। এক এক তীর্থে এক এক বৈচিত্র্য।

তিরুমালাইয়ের মানৎ করেছে,—ফল পাবেই পাবে। তবে যদি পারো চুল দিয়ে যাও। নিঃসন্তান সন্তান পাবে, স্বামী নিরুদ্দেশ,—খুঁজে পাবে তাকে, মাইনে বাড়বে, লটারির টাকা পাবে, উকীল জজ হবে, বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসবে, হারাধনকে ফিরে পাবে, দুশ্চরিত্র সৎ হবে, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় পাস করবে, মামলায় জিতবে, পক্ষাঘাত ভাল হবে, ক্যানসার রোগ সারবে, শত্রুর হাত থেকে নিরাপদে থাকবে,—এবং আর যা কিছু চাও। যদি পারো চুল দিয়ে যাও।

এখান থেকে বছরে এক কোটি টাকারও বেশি চুল বিক্রি হয়। তার প্রধান খদ্দের আমেরিকা। বিদেশী মুদ্রা অনেক আসে।

ক্যানটিনের অট্টালিকার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। লাউঞ্জের সঙ্গেই রিসেপশন। যা খাবে তার দাম দিয়ে দোতলার সেই মস্ত ডাইনিং হলে গিয়ে ওঠো। কাউণ্টারে টিকিট দিয়ে খাবার নাও। ডাল ভাত রুটি পরটা তরকারি পাঁপর মোহনভোগ ইদলি সম্বর দোসা রসম্—আরো অনেক। যা খুশি চেয়ে নাও। দই পাবে, ঘোল পাবে, পাবে না মোগলাই পোলাও, পাবে না টাকি তন্দুরে তৈরি, পাবে না কলিমুদ্দির হাতে তৈরি, কাবাব-কোপ্তা, চাচার কাটলেট, চাইনীজ চিকেন রোস্ট, বিলেতী বেকন, রাশিয়ান সাসলিক বা সোসিসকি। মাছ, মাংস, মুরগি, মদ?—নারায়ণ, নারায়ণ। পেঁয়াজ?—নারায়ণ নারায়ণ! তবে হ্যাঁ, উৎকৃষ্ট ও রুচিদায়ক রসম্-এর স্বাদে পাওয়া যায় রসুনের সুদূর আভাস। মহাকবিকে একটু উলটিয়ে বলি, সে যে, মধুর কতদূর, তখনই খেয়ে কি তুমি বোঝনি ঠাকুর?

খাওয়ার মধ্যে পাই জাতি ও সম্প্রদায়কে, ভাষার মধ্যে পাই চিত্তের ঐশ্বর্যকে, পোষাকের মধ্যে পাই রুচিকে। সকলের পরনে দক্ষিণী লুঙ্গী আর হাফশার্ট। লুঙ্গীর নিচে পাৎলা হাফপ্যাণ্ট। অধিকাংশ লোক লুঙ্গীর ঝুলটা তলা থেকে তুলে কোমরে গেরো দিয়ে বাঁধে—যাতে পায়ে হাওয়া লাগে। কুলি-মজুর, পানওয়ালা কফিওয়ালা, ছাত্র, অধ্যাপক, উকীল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার —ওই পোষাকে সব এক। বড় বড় ব্যাঙ্কে, বিমানঘাঁটিতে, রেল ষ্টেশনে, সরকারি আপিসে—ওই একই কথা। গেরোটা খুলে দিলে মুহূর্তে ভদ্র হওয়া যায়। কোটপ্যাণ্টপরা উচ্চবর্ণ জন-সমাজে নেই তা নয়, কিন্তু গরম দেশে শরীরের উপর বিভিন্ন বাঁধন ওদের সয় না। হাইকোর্টের জজ সামনে দাঁড়ালেন। মাথার পিছনে মস্ত চুলের গুচ্ছ বাঁধা, কপালে ও খালি গায়ে চন্দনলেপ, কাঁধে উড়ুনি, পরনে বেগুনি-পাড় লুঙ্গী, লুঙ্গীর নিচে লেংটি কিংবা জাঙ্গিয়া, পায়ে চটি। হাইকোর্টের জজ!

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে যে বেড়া, তার উপরে ওরা বসে নেই। ওরা পরম বিশ্বাসের উপরে দাঁড়িয়ে। ওরা বরং ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না। হাইকোর্টের জজ বিশ্বাস করেন, মানতের ফল ফলবেই। আধুনিক বিজ্ঞান কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করে, মাথা ন্যাড়া করে যাওয়া তার মিথ্যা হবে না। কুমারী মেয়ে মাথার চুল কামিয়ে বিশ্বাস করে তার পতি হবে শিবচরিত্র, দেবসেনাপতি কার্তিকের মতো রূপবান হবে এবং সত্য-বানের মতো প্রেমিক হবে। রাজনীতিক নেতা বিশ্বাস করেন শ্রীশ্রীভেঙ্কটেশ্বরকে পূজা করে গেলে নির্বাচনে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

কে?—ছমছমে সন্ধ্যায় থমকিয়ে দাঁড়ালুম,—হুয়ারিউ?

কালো লম্বা মুণ্ডিতমস্তক এক বয়স্ক যুবক হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়ে। পরিস্কার বাঙ্গলায় প্রশ্ন করল, আপনি বাঙ্গালী?

হ্যাঁ।—একটু খতিয়ে বললুম,—আপনাকে ঠিক—

আমি মাইশোরের। যুবকটি বলল, অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে দেখছি। একটু আলাপ করতে ইচ্ছে হল। সরকারি কাজে আমি সাত বছর পশ্চিমবঙ্গে আর আসামে কাটিয়েছি। বাঙ্গলা শিখেছি সেইখানে।

কথায় কথায় ভদ্রলোকটির সঙ্গে বে'শ আলাপ হয়ে গেল। উনি এখানে আসেন বছরে একবার। ওঁর মানৎ ফলেছে, একটি ছেলে হয়েছে। গত বছর থেকে ওঁর পদন্নোতি ঘটেছে! ওঁর মায়ের বিশ বছরের বাতের ব্যামো সেরেছে। পরিশেষে ওঁর বোনের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে।

এই সব শ্রীভেঙ্কটেশ্বরস্বামীর কৃপায়। ওঁর কৃপা না হলে, এতদূর আসব কেমন ক'রে? ওঁর কথা বললে বড়সাহেব হাসিমুখে ছুটি মঞ্জুর করেন। আমাদের জীবনের মূলে উনিই বসে আছেন! উনি আছেন তাই ত আমরা আছি! ওঁর সেবাতেই জীবনধারণ।

আমি যেন বাকরুদ্ধ অবস্থায় এই প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মচারী-টির কথাগুলি অভিভূতের মতো আধঘণ্টা ধরে শুনে যাচ্ছিলুম। অবশেষে ভদ্রলোক আমাকে যেন উচিত মতো শিক্ষা দিয়ে একসময়ে চলে গেলেন। দেখতে পাচ্ছিলুম এখনো মোটর বাস আসছে একখানার পর একখানা। হুড় হুড় করে নামছে মেয়েপুরুষ। এ যেন পঙ্গপাল—এর বিরাম নেই। সকল বয়সের সকল শ্রেণীর। শুনলাম যেদিন সবচেয়ে কম, সেদিনও পঞ্চাশ হাজার। কেউ পড়ে থাকে না পথঘাটে, সব ঘরে ওঠে। থাকার জায়গা অজস্র, অসুখ বিসুখের কোনও হিড়িক নেই, ভিক্ষে করে না কেউ, ঝগড়া বিতর্ক নেই কোথাও, স্বার্থের কোথাও সংঘাত নেই। কালীঘাটে কালীপূজা আর মহাষ্টমীর ভিড় দেখেছি. প্রয়াগের কুম্ভ দেখেছি কাশীতে অন্নকূট, বদরিকাশ্রমের দ্বারোদ্‌ঘাটন, রুক্মিণী-দ্বারকার রাসপূর্ণিমা, বাবা

বৈদ্যনাথের শিবরাত্রি, বৃন্দাবনের চতুর্মাস্য, অমরনাথের যাত্রীসমারোহ, দেখেছি একে একে। কিন্তু এ দেখিনি আগে। এক লাখ লোক—আশেপাশে কোথায় যেন গা ঢাকা দিয়ে রইল। এ ইতিহাস প্রত্যহের। সকালের যাত্রী দুপুরে, দুপুরের যাত্রী সন্ধ্যায়, সন্ধ্যার যাত্রী পর প্রভাতে—এইভাবে আসে আর চলে যায়। কিন্তু সকল সময় দাঁড়িয়ে থাকে ষাট-সত্তর হাজার লোক।

ক্যানটিন ছাড়িয়ে গেলে ঢাল-পথে সামনেই মন্দির। আশেপাশে বহু প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে। সামনেই মস্ত প্রবেশপথের কয়েকটা সিঁড়ি। এখান থেকেই কিউ দিতে হয়। মনে করেছিলুম সন্ধ্যার পর ভিড় থাকবে না। ভিড় নয় লাইন। লাইন মানেই কিউ। আমরা পিপিলিকাশ্রেণীর কাছে 'কিউ' দেওয়া শিখেছি। পিঁপড়েরা কখনও কিউ ভাঙ্গে না। কেউ ভেঙ্গে দিলে আবার সেই কিউ ধরে। এখানে প্রথম সিঁড়ি থেকেই কিউ ধরলুম। সন্ধ্যা এখন ৭টা পনেরো।

থমকিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। এক পা এক পা এগোচ্ছে। কোন্দিক দিয়ে কোথায় এগোচ্ছি জানার দরকার নেই। শুধু কিউ ধরে যাচ্ছি। রেলিং দিয়ে বাঁধা পথ,—যেমন রেল ষ্টেশনের থার্ড ক্লাস টিকিট কেনার ঝকমারি। সেখানে বিরক্ত হয়ে পিছলিয়ে চ'লে যেতে পারো, কিন্তু এখানে ভেঙ্কটেশ্বরস্বামীর ফাঁদে পা দিয়েছি,—পালাবার উপায় নেই,—এমন সরু রেলিং বাঁধা পথ! কিউ ধ'রে তোমাকে এগোতেই হবে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেভাবেই যাও—এগোতেই হবে! যদি ওই সুদীর্ঘ সর্পিল এবং জিগজ্যাগের কিউ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা পাও,—পারবে না! যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, যদি চিৎকার করে বলো, ভেঙ্কটেশ্বরকে মানি না, বেদ-বেদান্ত-ধর্ম-ঈশ্বর-ইহকাল-পরকাল-তন্ত্রমন্ত্র—কোনও কিছু মানি না, আমি ধর্মদ্বেষী, ঈশ্বর-বিদ্বেষী, আমি নাস্তিক—আমাকে মুক্তি দাও, পালাবার

পথ দাও, তবু তুমি বেরোতে পারবে না! ওই কিউ তোমাকে ধরে থাকতেই হবে। এবার তুমি মহাপালক বিষ্ণুর ফাঁদে পা দিয়েছ। আর তোমার মুক্তি নেই, সোজা মোক্ষলাভ। না, আমার মনের কথা কেউ শুনছে না।

চারিদিকের অবরোধের মধ্যে এক এক পা ক'রে এগিয়ে আমি মোক্ষলাভের দিকে যাচ্ছিলুম।

না, ধৈর্য থাকা দরকার। ছিপ হাতে নিয়ে অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে জলের ধারে বসে থাকতে হয়, তবে ফাৎনা নড়ে। বকপাখিকে ধার্মিকের ভঙ্গী নিতে হয়েছে মাছের লোভে সিদ্ধার্থ ছয় বছর চোখ বুজে বসেছিলেন বন্ধুত্বলাভের জন্য, একশ' বছর ধৈর্য ধরেছিলেন শ্রীমতী। না ধৈর্য থাকা দরকার।

সব দেওয়ালের গায়ে রঙ্গীন চিত্রাবলী। যত আছে পুরাণের গল্প, যত রকমের দৈবকীর্তি, যত রূপকথা তেলেগুর, যত কাহিনী গণেশের আর দুর্গার,—এ যেন বিরাট এক চিত্রশালা দেখতে দেখতে চলেছে হাজার হাজার মেয়েপুরুষ। এসব ছবি তোমাকে ভুলিয়ে রাখছে পাছে ধৈর্য্যচুতি ঘটে। তারিফ করতে করতে এগোও, সময় কাটবে। আলো জ্বলছে কক্ষের পর কক্ষে,—একই কক্ষে তিন-চারটে পিঁপড়ের সারি।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ সচেতন হলুম। এরা কারা? এই যাদের পিছনে পিছনে চলেছি আর যারা আসছে আমার পিছনে পিছনে? গুজরাটি, মারাঠি, তৈলঙ্গি, কন্নাড়ি, তামিলি, কেরেলি,—সকল সম্প্রদায়। ইতর সমাজ নয়। সুবেশ, সুসজ্জা, শৌজন্যশীল ভদ্র শ্রেণীর নরনারী। হাজার হাজার নেড়ামাথা একসঙ্গে এমন ক'রে দেখিনি। অগণিত সংখ্যক সকল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—অধিকাংশ নেড়া। বাড়ির গিন্নি, সত্ত বিবাহিত দম্পতি, স্বাস্থ্যবতী সুকুমারী, প্রবীন বয়সের মহিলা ও পুরুষ, বড় বড় সরকারি কর্মচারী কলেজের

অধ্যাপিকা,—অনেকেই নেড়া। শান্ত, শ্রদ্ধাশীল, ভক্তিমান, হাস্যো-জ্জ্বল—সেই জনতাকে দেখলে টনক নড়ে। এ যেন অল্প পরিসরের মধ্যে বৃহত্তর দাক্ষিণাত্যকে দেখতে পাওয়া। এ সেই তারা আজও বিশ্বাসে অটল ভক্তি শুচিশুদ্ধ দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধাবান। একই সুরে, একই লক্ষ্যে একই ভাবনায় সব বাঁধা। ওই হাজার হাজার কাতারের মধ্যে আমি যেন একা। আমি চটুল, সংশয়াচ্ছন্ন, বিশ্বাসের ওপর আমার নির্ভরতা নেই, অবিশ্বাসবাদের ওপরেও আমার জোর নেই—শুধু যুক্তি-বাদের জটিলতার মধ্যে আমি কিলবিল করছি। আমার ভাবাশ্রয় নেই, আমার ইলেকট্রন্, নিউট্রন, আমার সূচ্যগ্র চৈতন্যবিন্দু মহাকাশের ভিতর দিয়ে সূর্যবিম্ব পিছনে ফেলে অগ্নিদেবতার দিকে ধাবিত হচ্ছে না! আমি নিরুপায় অসহায় নিরাবলম্ব!

এর পর রেলিং ধরে যেতে যেতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উচ্চবেদীর মতো আর একটা রেলিংঘেরা নাটমন্দির। স্বর্ণমণ্ডিত নানা বৃহৎ মূর্তি, রৌপ্যমণ্ডিত বিভিন্ন আসবাবপত্র। সেখানে সবদিকে সোনা-রূপো আর জড়োয়ার ছড়াছড়ি। এ যেন যক্ষপুরী, স্বর্ণলঙ্কা। চারিদিকে তাকিয়ে এই বিপুল সম্পদ লক্ষ্য করে আমার সর্বভারতীয় মন কুঁকড়িয়ে আবার বাঙালী হয়ে এল। একি অন্যায়? এত সোনারূপো জড়োয়া জহরৎ পুষে রাখা কেন? এগুলো বিকিয়ে কত কাজ কারবার, কত ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা যেতো, কত বেকারের কাজ জুটতো, কত গরীব পরিবার খেয়ে-পরে বাঁচত! কিন্তু এসব ত' সস্তা শ্লোগান! ভারতীয় মন আমার ইচ্ছার অপেক্ষা রাখেনি। সে নিজের পথ ধরে হাজার হাজার বছর পেরিয়ে চলে এসেছে। অধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্র ক'রে সে সঞ্চয় করেছে, সেই সঞ্চয়ের স্তূপ নৈবেদ্যস্বরূপ উৎসর্গ করেছে তা'র প্রাণের দেবতাকে। অহঙ্কার নেই বলেই সম্পদ হয়ে উঠেছে ঐশ্বর্য। একদা সোভিয়েট ইউনিয়নে

দেখেছিলুম একটি সম্পদ সংগ্রহশালা। ক্যাথারিন-দি-গ্রেট, পীটার-দি-গ্রেট থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় জার নিকলাস পর্যন্ত যত হীরামুক্তা মণি মাণিক্যের সম্ভার সেই লৌহকক্ষে সংগৃহীত রয়েছে। সে-দৃশ্য দর্শককে সত্যিই বিস্ময়াহত করে। কত হাজার কোটি টাকা তাদের বর্তমান বাজার-মূল্য হতে পারে, অনুমান করা কঠিন। কিন্তু সেই কুবেরের ভাণ্ডার আধ্যাত্মবাদের দ্বারা অভিষিক্ত নয়!

অলিগলি চত্বর বেদী সঙ্কীর্ণ প্রশস্ত—সব রকম পথ কিউ ধ'রে পার হয়ে অবশেষে এসে পৌছলুম মূল মন্দিরের দরজায়। সোজা পথে হাঁটলে এই পথটুকু আসতে মিনিট তিনেক, কিউ ধরে আসতে লাগল দেড়ঘণ্টা। এখন পৌণে নটা। কিউ চলবে রাত দশটা পর্যন্ত।

মূলমন্দির আগাগোড়া স্বর্ণময়। সমস্তই সোনা যেদিকে তাকাও। অদূর মণিকোঠায় শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি, ভিতরটা প্রায় অবরুদ্ধ, ধূপ ও দীপে,, ফুল ও চন্দনে—সমস্তটাই আচ্ছন্ন। এই মূর্তি একদিনে যারা তু'বার দর্শন করতে পেরেছে, তাদের সৌভাগ্য অন্যের ঈর্ষার বস্তু। আমার মনে হ'ল আমি নির্বোধের মতো মিনিট খানেক চেয়ে রয়েছি বিষ্ণুমূর্তির প্রতি। আমার মনে নেই ওটা এক মিনিট না একটুকরো অনন্তকাল! আমি শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করলুম, না তিনি আমাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন--ঠিক বুঝতে পারলুম না। এবার ভিড়ের ভিতর থেকে বেরোবার পালা। এখন না আছে কিউ, না বা আগল। শ্রীবিষ্ণু এতক্ষণ পরে মুক্তির মধ্যে ছেড়ে দিল।.

এ স্থলে থমকিয়ে দাঁড়ালুম। সামনে ছয়ফুট উঁচু এক বিরাট ক্যাম্বিসের কলস, সেটা বাঁধা রহেছে লোহার শিকলে। তার তুপাশে তু'জন রাইফেলধারী সেপাই। ওই কলসের মধ্যে একে একে সবাই ফেলে যাচ্ছে টাকার নোট, সোনার অলঙ্কার, কেউ হীরের

আংটি, কেউ খুচরো মুদ্রা, কেউ গিনি, কেউবা মুক্তোর মালা! একটু অবাকই হলুম। এ ধরণের এমন বৃহৎ কলস কই আগে দেখিনি, তাও আবার অতি মজবুদ ক্যাম্বিসের। চার-পাঁচটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ এর মধ্যে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। কেউ দেখতে পাচ্ছে না ভিতরে কি পরিমাণ জমেছে শুধু হাত উঁচু করে ভিতরে প্রণামী ফেলে চলে যাও। শুনলুম মন্দিরের গেট বন্ধ হবার পর মধ্যরাত্রে এই কলস রোজ উপুড় করা হয়!

সেখান থেকে সরে গিয়ে নাটমন্দিরের পিছনে এলুম। এখানে দেবস্থানম্ ট্রাষ্টের জনকয়েক বিশিষ্ট কর্মচারি কথাবার্তা বলছেন এবং তাঁদেরকে ঘিরে রয়েছে কয়েকজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। ওঁদেরই এক-জনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি সবিনয়ে কয়েকটি প্রশ্ন কললুম। সেগুলি মন্দিরের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে। শুনলুম ১৯৫৫ সালে লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী চাঁদা চাইতে এলে এঁরা ১০ কে-জি সোনা তাঁর হাতে দেন। সেটি নাকি যুদ্ধের চাঁদা। পরিশেষে একটি প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বললেন, ওই কলসের মধ্যে দৈনিক প্রণামীর কলেকশন হয় কম-বেশি নগদ দেড়লক্ষ টাকা!

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম। গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল। বলে কি, দৈনিক দেড়লক্ষ! কিছুদূর এসে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছিলুম পিছনে। মূল মন্দিরের চূড়া ও গম্বুজ সমস্তটাই নিরেট পাকা সোনা। চারিদিকের আলোয় সেটি ঝলমল করছিল।

ধরো ব্যবস্থাটা যদি উলটিয়ে যায় একালে। ভারতের বড় বড় বড় নামজাদা মন্দিরগুলি প্রচুর শক্তিশালী। একালে বিড়লাগোষ্ঠির অসংখ্য ধনবান মন্দির, কানপুরে যুগিলাল কমলাপতের মন্দির, কাশীর শিবালয়ের নতুন বিরাট মন্দির—এগুলি ছাড়া যত আছে ভারতের প্রাচীন মন্দির—কালীঘাট, পুরী, কামাখ্যা, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী, পদ্মনাভস্বামী, দ্বারকা, বদরিনাথ, অযোধ্যা, বৈদ্যনাথ-এবং আরো কত

—এরা যদি সর্বপূজ্য হয়ে দরিদ্র থাকত আর দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ বিত্তশালী হয়ে উঠত—তবে কেমন হতো ?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত অন্ন জোটেনি। কিন্তু তিনি জগৎ-পূজ্য! রাজকুমার সিদ্ধার্থ হয়েছিলেন সর্বহারা, যীশুখৃষ্ট অতি দরিদ্রের সন্তান,—ওঁরা জগৎপূজ্য!

প্রভাতকালে পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম নিচের দিকে দিকদিগন্তব্যাপী সমতলের শোভা। দূরে দেখা যাচ্ছে সেই স্বর্ণমুখীর সোনালী ধারা, তার এদিকে গোবিন্দরাজস্বামী ও লক্ষ্মীর মন্দির। আরও দূরে দেখা যায় চন্দ্রাগিরির সেই বিশাল দুর্গ। আমি ঠিক কোন্‌দিকে এবার অগ্রসর হব এখনো ঠিক করিনি!

দক্ষিণাপথ

জনৈক মহিলা আমার কাছে কিছুকাল থেকে চিঠি দিচ্ছিলেন। চিঠিগুলির মধ্যে তাঁর শালীনতা, সৌজন্যবোধ এবং ভাষার এমন একটি মাধুর্য পাওয়া যেত—যার জন্য আমাকে এক-আধবার জবাবও দিতে হয়েছিল। ক্রমশঃ তিনি লিখছিলেন, আপনার অমুক-অমুক হিন্দিতে ছাপা গল্প আমি অমুক-অমুক তেলেগু পত্রিকায় আপনাকে না জানিয়েই প্রকাশ করেছি। আপনার কাছে এবার দুটি অনুরোধ জানাতে চাই। প্রথমটি, আপনি আমাকে একটি স্থায়ী অনুমতিপত্র পাঠাবেন—যাতে করে আমি আপনার লেখা নিয়মিত তেলেগুতে অনুবাদ করতে পারি। দ্বিতীয় অনুরোধ, হায়দারাবাদে কখনও এলে আমাকে দয়া করে আগে একটু জানাবেন।

মহিলা তাঁর হায়দারাবাদের ঠিকানা দিয়েছিলেন। তাঁর পরিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় লেখা চিঠি আমার মনে ছিল।

ওই পর্যন্তই। এর পর কেটে গিয়েছে বোধহয় বছর দুই। আমার পা দুখানা চলে গেছে আপন মনে নানা ভ্রমণে। কখনও আম্বালায়, কখনও ভূটানের দিকে, কখনও বা ছোটনাগপুরে। কিন্তু একটা সময় এল, যখন অন্ধ্রপ্রদেশের ফাইলটি আমাকে নাড়াচাড়া করতে হল। অর্থাৎ ডাক এল দাক্ষিণাত্যের দিক থেকে।

আমি উত্তর ভারতায় মানুষ। শীত আমার প্রিয়। ফিনফিনে হাওয়াই পোশাকে আমি অতটা অভ্যস্ত নই। বছর চারেক আগে একবার যোশীমঠে বিড়লা ধর্মশালায় যখন উঠেছি, দেখি সেখানে দক্ষিণীদের জটলা। অধিকাংশ পুরুষের গায়ে মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী এবং তার চেয়েও মিহি ধুতি। সেদিন এক পশলা বৃষ্টির পর তাঁদের

দশাটা কেমন দাঁড়িয়েছিল, সেটা দেখেছিলুম বৈকি। সেই পোশাকেই তাঁরা যাচ্ছিলেন বদরিনাথে, ফিরতি পথে যাবেন কেদার। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে পশমের পোশাক নেই। আমরা উত্তরীয়, সব রকম পোশাকে অভ্যস্ত! দক্ষিণীরা উত্তরের সঙ্গে পরিচিত নয়।

অন্ধ্রের রাজধানী হল হায়দারাবাদ। এটি ভারতের বৃহত্তম পাঁচটি শহরের মধ্যে একটি। কিন্তু হায়দারাবাদ একা থাকেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সিকান্দারবাদ। যেমন কলকাতার সঙ্গে বালীগঞ্জ। আমাদের মন নোংরা শহর কলকাতার সঙ্গে যুক্ত, সেই কারণে অন্যান্য ভারতীয় নগরের পরিচ্ছন্নতা দেখলে একটু অবাকই হই। বেগমপেট বিমানবন্দরে ঝাঁপিয়ে পড়ে যখন সিকান্দারাবাদের ভিতর দিয়ে হুসেন সাগরের উৎফুল্ল বায়ুহিল্লোল পেরিয়ে হায়দারাবাদের দিকে যাচ্ছিলুম, তখন দেখছিলুম এই সুন্দর শহরের মনোজ্ঞ পৌরব্যবস্থা। হুসেনসাগর একটি মস্ত হ্রদ, এবং এটি সকাল-সন্ধ্যায় বায়ুসেবীদের পদচারণার জায়গা। জলাশয় এবং জলস্রোত মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ করে। সেইজন্য পৃথিবীর সব দেশেই নদীতট ও সমুদ্রতীরের এত কদর। ভারতবর্ষে কোবালম, জুহু, দিঘা, গোপালপুর—এরা জগৎপ্রসিদ্ধ।

তেলেঙ্গানাকে একটি অতি ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার জন্য মাঝে মাঝে যে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, হায়দারাবাদ জেলা তারই অন্তর্গত। মোট নয়টি জেলাকে তেলেঙ্গানার মধ্যে আনার চেষ্টা চলে আসছে। এই নয়টি জেলাই প্রাকৃতিক সম্পদে একদিকে যেমন সমৃদ্ধ, অন্যদিকে উন্নয়নমূলক বহুপ্রকার কার্যসূচী এইদিকেই যেন বেশি। এই তেলেঙ্গানার মধ্যেই রয়েছে উত্তর-পশ্চিমে নিজাম-সাগরের বিশাল জলাশয়—যার থেকে লক্ষ লক্ষ একর জমি ফলবান হয়। তারই পূর্বপথে পড়ে ওয়ারাঙ্গল—যার তুল্যজাত মিহি বস্ত্রাদি এককালের ঢাকাই মসলিনের মত জগৎসভায় প্রসিদ্ধ ছিল। বিশ্ব-

বিশ্রুত পর্যটক মার্কোপোলো এই অঞ্চলে একদা ভ্রমণ করতে এসে বলেছিলেন—'এখানকার সূতাবস্ত্র উর্ণনাভের তন্তুজালের মতই সূক্ষ্ম, এবং পৃথিবীতে এমন কোনও রাজা বা রাণী নেই ; যিনি এই বস্ত্র পরিধান করিতে চাহিবেন না।'

প্রায় চারশ' বছর হতে চলল হায়দারাবাদ নগরী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিস্ময় এই, পুরনো যুগের ছাপ কম। এ শহরের বয়স এখনও যেন হয়নি, সজীবতা এখনও অম্লান। প্রথমকালে হায়দারাবাদের নাম ছিল ভাগমতী নগর। তৎকালীন নবাব—যিনি এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন—সেই মহম্মদকুলি কুতব শাহর এক আদরিণী রক্ষিতা ছিলেন। তাঁরই নাম ছিল ভাগমতী। কুতব শাহ গোলকোণ্ডার দুর্গে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। গোলকোণ্ডার ভগ্নাবশেষ পার্বত্য দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে দেখলুম, হায়দারাবাদ এখান থেকে মাইল পাঁচেকের বেশি নয়। এ অঞ্চলে 'কোণ্ডা'র স্থানীয় অর্থ হল পাহাড়। অর্থাৎ গোলাকার পাহাড়। গোলকোণ্ডা সবাই দেখতে যায়—সবাই নিরাশ হয়ে ফেরে।

কোনও দুর্গেই আজকাল কিছু নেই। যা আছে তা শুধু গল্প। পুণায় শিবাজীর সাঁইয়ারওয়াড়া, চিতোরের সেই ভগ্ন দুর্গ, গোয়ালিয়রের মানমন্দির, ঝাঁন্সীর দুর্গ, বন্য বেত্রবতীর ধারে সেই ওর্ছা দুর্গ সেই বন্যপশু সমাকীর্ণ এবং দস্যু-অধ্যুষিত অরণ্যময় ওর্ছার ভগ্নাবশেষ নগরী—যার জনশূন্যতা উপলব্ধি করলে গা ছমছম করে। সেই খরতরা বেত্রবতীর পথ চলে গিয়েছে 'মাতাটিলা'র বিশাল জলভাণ্ডারের দিকে। আরও আছে সংখ্যাতীত দুর্গ—যেগুলি অতি পরিচিত।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে সর্বনাশা প্লেগ রোগ সমগ্র তেলেঙ্গানাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। সেই মৃত্যু ছিল সর্বব্যাপী। তখন ক্ষীণস্রোতা সংকীর্ণ মুসিনদীর দুই পারবর্তী হায়দারাবাদ নগরটিও অন্তিম নিশ্বাস ফেলতে থাকে। এই মহামারী যখন লক্ষ লক্ষ প্রাণবলি গ্রহণ

করে একদা শান্ত হয় তখন সেই ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত গোলকোণ্ডার রাজ্য কুতব শাহ প্লেগ মহামারীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি সুদৃশ্য ইমারৎ নির্মাণ করেন এবং তার চার কোণে চারটি বৃহৎ মিনার দাঁড় করান। এই অতি উচ্চ ইমারতেরই নাম 'চারমিনার'। এটি হায়দারাবাদের ল্যাণ্ড-মার্ক, এবং এটি জনবহুল নগরের মাঝখানে অবস্থিত। দুটি বৃহৎ তোরণের গাম্ভীর্য ও মহিমা আজও সর্জ.ব এবং পর্যটক মাত্রই এখানে সবিস্ময়ে থমকিয়ে দাঁড়ায়।

একটি নদীর দুই পার একই শহর—এমন আছে অনেক। যেমন সীননদীর দুই পার প্যারিস, টেমস-এর দুই পার লণ্ডন, যেমন বুডাপেস্ট, যেমন মস্কো, যেমন শ্রীনগর—আরও অনেক আছে। সর্বাপেক্ষা বিপদ, এই নগরের সাধারণ জলাভাব। একেই তো এটি মালভূমি, তার ওপর নোংরা মুসিনদী মজে রয়েছে। সেইজন্য এই নদীরই উজানপথে কয়েক মাইল দূরে ওসমানসাগর এবং হিমায়ৎসাগর—এই দুটি অতি বৃহৎ জলভাণ্ডার হায়দারাবাদের পানীয় জল যোগায়।

মুসলিম সংস্কৃতির একটি অতি প্রধান কেন্দ্র হল হায়দারাবাদ। সমগ্র বিশাল নগর মসজিদ, গম্বুজ, মিনার প্রভৃতিতে ভরা। এ যেন এসে পড়েছি বুখারা সমরকন্দ লাহোর মুলতান—এবং ওই ধরনেরই কোনও এক মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রে। আহার-বিহারের রুচি, আভিজাত্যবোধ, গীতবাদ্য, নৃত্যকলা, বিলাসের বিভিন্ন উপকরণ, সাচ্চাজরি ও মখমলের পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন প্রকার রুচিকর খাদ্য —সমস্ত মিলিয়ে একটা আনন্দদায়ক পরিবেশ। এক সময় মক্কা মসজিদের সুবিশাল দৃশ্য এবং কারুকার্যের সৌন্দর্য দেখে থ হয়ে গিয়েছিলুম। এককালে নবাব মহলের যাঁরা প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠতেন, তাঁদেরকে 'লাট' বলা হত। সেই সব নারীদের পছন্দসই যে সব সামগ্রী ও অলঙ্কারাদি যে-অঞ্চলে কেনাকাটা চলত, সে-অঞ্চলের নাম হল 'লাটবাজার'। এই বাজারে ঢুকলে এখনও বাইরের লোকের

চোখ ঝলসিয়ে যায়। কিন্তু এই মুসলিম সভ্যতাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে যে বৃহৎ জনসমাজ রয়েছে তারা মুসলমান নয়। তবু তাতে কি এসে যায়? সর্বভারতীয় সংহতির সঙ্গে এটি অনায়াসে মিলে রয়েছে, এবং সদ্ভাবের সঙ্গে সগর্বে রক্ষিত হয়ে চলেছে।

নালগোণ্ডা জেলার ভিতর দিয়ে প্রশস্ত সুন্দর পথ। ধূ ধূ করছে দুই ধারের বিস্তৃত প্রান্তর। কোথাও রুক্ষ, কোথাও বা বনময়। আগে বলেছি, দাক্ষিণাত্য একটা বৃহৎ মালভূমি মাত্র। আর এ মালভূমি কূর্মপৃষ্ঠ। কোথাও জলচিহ্নহীন অনুর্বরতা, কোথাও হঠাৎ সামনে আসে হরিতের শ্যামলিমা।

মোটরবাস আমাকে তেলেঙ্গানার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নব্বই মাইল পথ। মধ্যাহ্নকাল থেকে অপরাহ্ণ—প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগল। আমি যখন একা, তখন জোর পাই দেহ-মনে, তখন আমি বলবান, অনেকটা যেন দুর্ধর্ষ। তখন সব জানা, সব চেনা, সকলের উপর দখল। সম্পূর্ণ একা মানে সম্পূর্ণ সুস্থ—যত খরচ হয় শক্তি, ততই যেন যোগান পাই। নিজের মনে আমি কথা কইতে কইতে যাই —সেকথা কে যেন ভিতর থেকে বলছে, কে যেন কান পেতে শুনছে।

নালগোণ্ডার প্রান্তে এসে পাওয়া গেল কৃষ্ণা নদী। ওপারে গুণ্টুর জেলা, এবং তার প্রথম রেলস্টেশন হল মাচের্লা! মাচের্লা থেকে গুণ্টুর শহর, তারপর বিজয়ওয়াড়া। তার পশ্চিম-পথে পড়ে অমরাবতী—বহুকাল আগে যেখানে আমার সুখশয্যা পাতা ছিল! যাই হোক মোটরবাস যেখানে এসে থামল সেটি হয়তো এককালে গ্রাম ছিল, এখন সেটি সরকারী খাসে এসেছে। এটিকে এখন নাগার্জুন সাগরের তোরণদ্বার বলা চলে। বহুদূরে দেখতে পাচ্ছিলুম একটি ক্ষুদ্র শহর, নাম পাইলন।

সামনেই প্রজেক্ট হাউস—প্রশস্ত ও সুন্দর আধুনিক অট্টালিকা। তারই কোলে মস্ত পুষ্পোদ্যান। এখন মাঘের শেষ—কিন্তু চৈত্রের মত গরম হাওয়া। সুতরাং এরা জানে, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান ছাড়া পর্যটকরা থাকে না, এবং তার সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের ব্যবস্থা। বস্তুত এ দুটি ছাড়াও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ চলে না। ডিসেম্বর বা জানুয়ারী—এ দুমাস কম গরম এই যা। যা হোক, দোতলার একটি আসবাবপত্র সমেত ভাল ঘর পাওয়া গেল। ২৪ ঘণ্টার জন্য ছয় টাকা। নিচের তলায় নিরামিষ ক্যান্টিন। ইদ্‌লি, দোসা, সম্বর, রসম, নারকেলের তরকারি, টক দই, পাঁপর, ঘোল—আর কি কি যেন।

কৃষ্ণা এখানে বাঁধা পড়েছে। যেমন বাংলার অজয় আর দামোদর—যেমন তিলপাড়া, তিলাইয়া, মাইথন বা মাসাঞ্জোড়—এও তাই। কৃষ্ণা দুর্গতি আনে বর্ষায় এবং শুকিয়ে যায় শীতকালে। সেই একই কাহিনী এবং একই তার পূর্তবিদ্যা। যদি পারো গভর্নমেণ্টকে হাততালি দাও এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার জয়গান করো। কিছু না পারো, চুপ করে দেখে চলে যাও। আমার কাজ নিঃশব্দে দেখে চলে যাওয়া।

একটি বৃহৎ উপত্যকার ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর-পথ চলে এল কৃষ্ণার বাঁ দিকের তটে। ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করল সমুদ্রবৎ একটি বিস্তীর্ণ নীলাভ বারিধি। এরই নাম নাগার্জুন সাগর, এবং এটি কৃত্রিম। এ যেন পৃথিবীর মধ্যে একটা গুপ্তলোক। তিনদিকে নাল্লামালাই পর্বতমালা, যার প্রাচীন নাম শ্রীপর্বত—আরেক দিকে বিপুল জলরাশির অন্তহীন ভাণ্ডার। এদেরই মাঝখানে একটি দ্বীপের মত উঠেছে উচ্চশীর্ষ নাগার্জুনকোণ্ডা বা পর্বত। এই ভূভাগের প্রাচীন নাম ছিল বিজয়াপুরী। এই সুবিশাল ভূভাগ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল।

খৃষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন এই অঞ্চলে বসবাস করতেন এবং বিজয়াপুরীর তিনিই ছিলেন অধীপতি।

এখানকার কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টির আগে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সাল অবধি শুধু মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এক একটি কালের এক একটি সভ্যতাকে মৃৎলোকের মৃত্যুগহ্বর থেকে তুলে আনে। কিন্তু ছয় বছরের বেশি সময় দেওয়া চলছিল না। কেননা এ ভূভাগে বর্তমান কালে জল ছাড়া সমস্তই অচল। সবচেয়ে বড় কথা চাষবাস এবং মানুষের খাদ্য। তারপর জলবিদ্যুৎ, তার সঙ্গে সংলিপ্ত বিভিন্ন শিল্পোন্নয়ন, অর্থাৎ দেশের শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং এরই মধ্যে সব কাজ সেরে নাও। সময় কম। এই বেলা জল বেঁধে নাও।

সেই প্রস্তর যুগ থেকে মানুষের কীর্তি মাটির স্তরে স্তরে জমেছিল সাম্প্রতিক মধ্যযুগ পর্যন্ত। লক্ষ বছর চলে গিয়ে দু'হাজার বছর আগে এসে থেমেছে। একে একে অনেক প্রাচীনের সাক্ষ্য পাওয়া গেল। একশ'র বেশি মাটি ও পাথরের স্তর খনন করা হল, এবং একে একে পুরনো ইতিহাস—প্রাগৈতিহাসিক বলতে বাধা নেই—উঠে এল আপন আপন গৌরব সঙ্গে নিয়ে। সেগুলি সযত্নে জমা করা হল শ্রীপর্বতের চূড়ায়, বৌদ্ধযুগ থেকে যার নাম দেওয়া হয়েছিল নাগার্জুনকোণ্ডা।

সকল কাজ অতঃপর অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হলেন কর্তৃপক্ষ। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বললেন, আর উপায় নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ বললেন, প্রত্নতত্ত্বের এত বড় সর্বনাশ আর কোনদিন হয়নি।

কৃষ্ণার সেই উপত্যকায় দুশ ফুট জল উঁচু হয়ে এক কৃত্রিম নীলাভ সমুদ্রের সৃষ্টি হল। শ্রীপর্বতের উত্তুঙ্গ গিরিমালা এই বিস্তীর্ণ জলাশয়কে আজ ঘিরে রয়েছে। সভ্য জগতের থেকে অনেক দূরে ভীষণা প্রকৃতির এক বিজনলোকে এই বৃহৎ জলাশয়ের দৃশ্য মানুষের মনে কাব্যের আস্বাদ আনে। আমিও তেমনি আলস্যের অজস্র আকাশের মধ্যে জলযানের উপর যেন ভেসে ভেসে যাচ্ছিলুম। যেমন ভেসে-

ছিলুম কাশ্মীরের ডালহ্রদে হরিপর্বতের নিচে, যেমন ভাসতে ভাসতে গিয়েছিলুম থেকাড়ির অন্তর্গত পেরিয়ার হ্রদে বন্য হাতীর স্বচ্ছন্দ চলা-ফেরা দেখতে—ভারতের সুদূর দক্ষিণাঞ্চল কেরালায়। যেমন অলস এক মধ্যাহ্ণে একদা পদ্মার উপর দিয়ে সাতবাড়িঘাট থেকে ফরিদ-পুরের রাজবাড়ির দিকে। যেমন সারা দিনমান ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেটে যেত আত্রেয়ী, মধুমতী, ভৈরব আর নবগঙ্গায়। আর সেই ভাদ্রের ভরাজল চলন-বিলের তরঙ্গে-তরঙ্গে।

নীল জলরাশির উপর দিয়ে এক সময় এসে পোঁছলুম সেই কতকালের প্রাচীন নাগার্জুনকোণ্ডার ঘাটে। কিছু দূর উপরে উঠে গেলে সমতল ভূভাগে যাত্নঘরের একটি প্রসাদোপম অট্টালিকা। ভিতরটি অতি সুদৃশ্য এবং আধুনিক ধরনের—দিল্লীর ন্যাশন্যাল মিউজিয়মের মত। দেখতে পাচ্ছিলুম বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, নানাবিধ হাতিয়ার, কত রকমের ভাস্কর্য, বিচিত্র এক একটি রেপ্লিক, বহুবিধ মডেল, বৌদ্ধমূর্তির নানা গঠন, পুরনো কালের মণিমুক্তা, মুদ্রা, অলঙ্কার, সোনা, রূপা, তামা ও বর্ণাঢ্য মৃৎশিল্প—এবং এদেরই সঙ্গে সংখ্যাতীত দ্রষ্টব্য সামগ্রী। আমি প্রত্নতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ নই, সুতরাং এ সম্বন্ধে আনুপূর্বিক বিচার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানকার কয়েকটি বুদ্ধমূর্তির যে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে তা অনবদ্য।

সন্ধ্যের আলো জ্বলছে না তেলেঙ্গানার জাতীয় সড়কে। কিন্তু পথের দুধারে বনময় মাঠে ও ময়দানে শত সহস্র ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে, এ দৃশ্য উৎসুক্য আনে। হায়দারাবাদ জেলার আগাগোড়া আঙুরের ক্ষেতে পরিপূর্ণ। আঙুরে পাক ধরলে পাছে রাত্রের দিকে চুরি হয়, সেজন্য হাজার হাজার লোক আলো জ্বেলে পাহারা দেয়। এ অঞ্চলে বছরে কোটি কোটি টাকার আঙুরের কারবার চলে।

ফেব্রুয়ারী ও মার্চে সমস্ত বাজার আঙুরের আমদানিতে ভরে ওঠে। খুচরো দাম এক কেজি এক টাকা থেকে বড়জোর দেড়টাকা। চা খেয়ো না, জলযোগ করো না—যত পারো আঙুর খাও। মুখভরা রস, বুকভরা মধু। বিহার বা উত্তর প্রদেশে রেলগাড়ীর হিন্দুস্থানী যাত্রীরা যেমন অজস্র আখ ও চিনাবাদাম চিবোয়—তেমনি হায়দারা-বাদের জনসাধারণ প্রতি কথায় আঙুর চিবোয়। ট্যাক্সির ড্রাইভার সাইকেল-রিক্সার চালক, মুচি ও ধোবা, পানওয়ালা ও মজুর-মিস্ত্রী—এরা এবং আরও নানা শ্রেণীর মানুষ সস্তায় আঙুর কিনে কোঁচড়ে রাখে। স্কুল বা কলেজের ছেলেমেয়েরা আঙুর দিয়ে জলযোগ সারে। আমি এক সময় আড়াইশ' গ্রাম ওজনের সুপক্ক ও নধর আঙুর কিনে কয়েক পা সরে গেলুম, এবং সমস্ত আঙুরগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে সজোরে নিংড়িয়ে দেখলুম, কত রস ঝরে পড়ে। নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম!—হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এটাই ভেবেছিলেন।

আমি যখন এক শরবতের দোকানে হাত ধুয়ে চলে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, আঙুর বিক্রেতা অদূরে দাঁড়িয়ে আমার আচরণ আগাগোড়া নিরীক্ষণ করছিল। তা দেখুক, আমি বাঙালী, রসকে নিংড়িয়ে বার করি, রক্তেও মাখামাখি করি দুই হাত।

শহরের মধ্যে নিজামের যে প্রসাদ,—সেটি এক অপ্রশস্ত পথে। খুঁজে খুঁজে গিয়ে তার ফটক পেরিয়ে ভিতরে গিয়ে উঠলুম। এটির নাম 'কিং কোঠি'। কিং?—একটু চমক লাগল। রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণ-ডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে।' এ গণতন্ত্রের কিং কোথায়? ছিল তালপুকুর, এখন আর ঘটিটিও ডোবে না। কেল্লা নেই, কামান নেই, এখন কাঠের বন্দুকে বারুদের গুলীও ফুরিয়ে গেছে। এদের মূল উৎপত্তি ছিল তুরস্কে, পরে মোগলের সঙ্গে মিলে যায়। এরা ভারতবর্ষের পেটে ক্যান্‌সার রোগের মত চাক বেঁধে ছিল। ১৯৪৮ সালে

জেনারেল চৌধুরী এখানে শল্য চিকিৎসা করেন। রোগী কিছুটা সুস্থ হয়। কিন্তু আখেরে বাঁচেনি কেউ। শুধু পালিয়ে বেঁচেছিল লায়েক আলি।

'কিং কোঠি'র চলতি বৈঠকখানা পর্যন্ত কোনও মতে দেখতে পেয়েছিলুম! এর বেশি এক পাও এগোতে দেয় নি। উপর মহলে হয়তো বিবিধ সম্পর্ক এবং রাজকীয় ঐশ্বর্য বর্তমান।—শুনলাম এখান থেকে ১৪ মাইল দূরে ফালুকনামা, সেখানেই আসল প্রাসাদ ও রাজবৈভব। নিজামের পক্ষের কয়েকজন সেপাই সান্ত্রী এখনও রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওরা আমাকে এই প্রাসাদের জনশূন্য অন্দর মহলে যেতে দিতে একেবারেই রাজী নয়। যেই শুনল বাঙালী তখন আরও বিমুখ হল। আমি তখন বললুম, বেশ, চলেই যাচ্ছি এ যাত্রা। চুলে আমার পাক ধরেছে, মাথায় টাক পড়েছে। কিন্তু মনে রেখো, এর পরের যাত্রায় নকশালী হয়ে এসে ঢুকব।

ক্যা ?—কমাণ্ডার বড় বড় চোখে তাকাল।

রাগে গসগসিয়ে চলে গেলুম।—

কিন্তু যতই রাগ করি, নিজামের দান-খয়রাতের কথা ভুলি নি। এককালে নিজামের মত বিত্তশালী পৃথিবীতে আর কে ছিল আমার জানা নেই। আলীগড় মুসলীম বিদ্যালয়, কাশী হিন্দু বিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি অগণিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান—নিজামের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার বেশ মনে পড়ছে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের এমনি এক মাঘ মাসের সকাল বেলাকার কথা। জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলায় একটি কোণের ঘরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি বসে তাঁর সকৌতুক কথাবার্তা শুনছিলুম। বেলা আন্দাজ ন'টা। এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ ঘরে এসে ঢুকলেন। হাসিখুশি মুখে বললেন, কাকা শুনেছ, নিজাম তোমাকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন? কাগজে আজ বেরিয়েছে যে।

আনন্দে সেদিন মহাকবির মুখ-চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

শান্তিনিকেতন উপকৃত হল বটে, কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। অমৃতকণ্ঠের যে বাণী এতক্ষণ দুই কান ভরে শুনছিলুম, তাতে ছেদ পড়ে গেল। আমি সেদিন লাখ টাকা খুইয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম! সেই থেকে নিজামের প্রতি আমার আক্রোশ। তুমি কি বাপু খয়রাৎ করার আর তারিখ খুঁজে পাও নি?

আরেক কারণে আমার মন বিরূপ ছিল। তরুণ বয়সে প্রথম দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উপলক্ষে রায়চূড়ের এক ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছিলুম। সেখানে জলের অসুবিধা ছিল। সেই সূত্রে ধর্মশালার রক্ষীর সঙ্গে আমার বচসা বাধে। আমাকে লোকটা চোখ রাঙায় এবং আমিও আগুন হই। অবশেষে সেই ষণ্ডা লোকটা মারমুখী হয়ে বলে, এ তোমার হিন্দুস্থান নয়, এটা নিজামের স্বাধীন রাজ্য! এ বাড়ির নাম নিজাম কোঠি। এখানে তোমার হিন্দুস্থানের এক্তিয়ার নেই। আমি তোমাকে এখনিই বার করে দিতে পারি।

অসভ্য লোকটার পেশীবহুল চেহারার দিকে তাকিয়ে আমিও প্রখর কণ্ঠে বলেছিলুম, তুমি বার করে দেবে, সাধ্য কি তোমার? আমি নিজেই যাচ্ছি!

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলেছিলুম, হ্যাঁ যাচ্ছি, এমন স্বাধীন রাজ্যে আর আসব না। তবে আবার কখনও যদি আসি, ভাল করে ব্যায়াম শিখে আসব।

ধর্মশালার পরিচারিকা অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

না, এখন সেকাল নেই। অন্যকাল। সেদিন ইংরেজ বড়লাটের পাশে থাকত হায়দারাবাদের নিজাম—যার আতিথেয়তা পেলে ভাইসরয়ও পরিতৃপ্ত হতেন। মণি-মাণিক্য হীরা মুক্তা পান্না জড়োয়া জহরতে ভরে উঠতো বড়লাটের ঝোলাঝুলি। কলকাতার বেল-ভেডিয়ার প্রাসাদ হয়ে উঠত স্বর্ণলঙ্কা। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৫ই জানুয়ারী—এই একমাস বিলাস-ব্যসনের স্রোতে ভেসে থাকত

কলকাতা। যত রাজ রাজড়া মহারাজা—তখন সব কলকাতায়। কাশ্মীর, বরোদার গাইকোয়াড়, নিজাম, কোচিন ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর বেরারের রাজকুমার, জয়পুর আর যোধপুর, বিকানের আর জয়শলমের উদয়পুর আর ভরতপুর—সব মিলিয়ে কমবেশ পাঁচশো'। চৌরঙ্গী আর সাহেবটোলায় বিলেতী মদের স্রোত বইত, এবং অন্যদিকে গরু ছাগল ভেড়া হরিণ মুর্গি হাঁস—এরা হাজারে-হাজারে প্রাণবলি দিত। আঙুর কিসমিস কমলালেবু আপেল—এদের বাজার লুট হয়ে যেত।

না, একাল সেকাল নয়।

হাট-বাজার বিপণি-বেসাতিতে ছেয়ে রয়েছে হায়দারাবাদ। নবাব-ব্রিজের এপারে যা, ওপারেও তাই। যান-বাহনে ঠাসা পথ, যেন দিল্লীর চাঁদনি-চৌক, কলকাতার বড়বাজার, ফোর্ট বোম্বাই, আগ্রার ছিপিতলা—শহর মানেই ঠাসাঠাসি। সেকেন্দ্রাবাদ এত যানবাহনে আকীর্ণ নয়। সেখানে শান্ত আভিজাত্য, রুচিশীল জীবন-ব্যবস্থা—যাকে বলে সম্ভ্রান্ত ভদ্রসমাজ।

গায়ে হাওয়া লাগিয়ে একদিন গিয়ে পৌঁছিলুম ওসমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় পল্লীতে। হায়দারাবাদ থেকে মাইল পাঁচেক দূর। এটি বেশ নিরিবিলি অঞ্চল। দূর দূরান্তর পেরিয়ে চোখের দৃষ্টি ছুটে যায়। শত শত একর জমি নিয়ে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, অধ্যাপক-পল্লী, গবেগষণাগার, খেলার মাঠ, বিচরণের বৃহৎ ক্ষেত্র, কৃষিবিদ্যা-গবেষণার উপযুক্ত স্থান—সমস্তটা মিলিয়ে যেন একটা সুবৃহৎ অবকাশ। নাগরিক জীবন ও ছাত্রজীবন এক নয়। ছাত্রের জন্য প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশ, মনোরম জীবন-ব্যবস্থা, নিরুদ্বেগ সচ্ছলতা চারিদিকের আনন্দময় পটভূমি। জনবহুল নগরের হাট-বাজারের আশে পাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে, ছাত্র-জীবনের যে সর্বনাশ ঘটে ; কলকাতাই তার প্রমাণ। ওসমানিয়ার আর্ট হিউম্যানিটিজ, বিজ্ঞান বিভাগ ও তার গবেষণাক্ষেত্র, তার সুবৃহৎ

পাঠাগার, তার শিল্পকলা বিভাগ—এবং সবচেয়ে যেটি প্রথম চোখে পড়ে, সেটি ছাত্র ও ছাত্রীদের অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার। আমি অনেকগুলি ছাত্র ও ছাত্রীর সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে আলাপচারী করেছিলুম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ক্যান্টিন বা ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে সেটি মেয়েরাই চালায়। অত্যন্ত অল্প দামে ভাল জলখাবার খাওয়া যায়। কলকাতার কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

না, ভাল লাগছে না—এবার ছেড়ে যাব। রয়েল রেষ্ট হাউসের দোতলার কোণের ঘরটি আমার প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রিয় মানেই মোহ। মোহ ঘুচুক। প্রতিদিন প্রভাতে ছোট ছোট হলদে রংয়ের পাখিরা এসে ঘুম ভাঙিয়ে যায়। বারান্দায় এসে দাঁড়ালে ঠিক সামনেই বৃহৎ এক গির্জার বাগান—সেখানে বড় বড় গাছে এসে সবুজ টিয়ারা ঝগড়া করে যায়। এ গলির পথ অনেকটা নিরিবিলি। পশ্চিম দিক থেকে এসে এই গলিপথ পূর্বদিকে কোথায় যেন বিবাগী মন নিয়ে চলে গেছে। না, এবার মোহ ঘুচুক।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে একদিন মুসিনদীর পুল পেরিয়ে দেখতে গেলুম শালারজঙ যাদুঘর। এ নাকি একান্তই দ্রষ্টব্য। না দেখলে বলবে বেরসিক, দেখলে বলবে আদেখলে। ভিতর বাগে এ যেন রাজকীয় বৈভবের বাহ্বাস্ফোট। কত জরি আর মখমলের পোশাক, কত নবাব আর সেনাপতির তৈলচিত্র, কত আসা-সোঁটা, কত বা ঢাল তলোয়ার। সম্পদের প্রাচুর্য দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেল। শুধু বিত্তের প্রাচুর্য, চিত্তের মাধুর্য নয়। নিচের তলায় দোতলায়, কোরিডোরে, বারান্দায়—সর্বত্র বর্ণাঢ্য সম্পদ। কী হবে বৈভবে, যদি জীবনের উনতি না ঘটে? না, শালারজঙ যাদুঘর যত মনোরমই হোক, আমার মন নেই। মানুষের মহৎ কীর্তি এসব নয়, উন্নয়নশীল জীবনের এ চিহ্ন নয়—যেখানে মহিমা আছে বিরাট ত্যাগের, যেখানে সামগ্রিক প্রকাশ আছে মনবতার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের মরণজয়ী

সংগ্রাম আছে যেখানে—তেমন ইতিহাস নিয়ে কোন যাদুঘর কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ?

সেখান থেকে বিরক্ত হয়ে চলে গেলুম। ঘুরলুম বাজারের আনাচে কানাচে সব্জি মণ্ডির আশে পাশে, নোংরা পল্লীর আঁদাড় পাঁদাড়ে। এ বরং ভালো। দারিদ্র্য এখানে কাঁদতে বসেছে, দিন-যাপনের গ্লানি এখানে প্রকট, অপমানিত জীবন মাথা হেঁট করে রয়েছে। সত্য ও বাস্তব এখানে সুস্পষ্ট।

বাঙালী মহলে সেদিন সরস্বতী পূজো। তাঁদের ক্লাব আছে, থিয়েটারের শখ আছে, এবং সামাজিক মেলামেশার আনন্দ আছে। কেউ আছেন অনেক কাল, কারও বদলীর চাকরি, কেউ অধ্যাপক বা ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়ার, কেউ বা কিছু ব্যবসা ও কাজ-কারবার নিয়ে আছেন, আছেন কেউ বা পেন্সনভোগী। এঁদের সঙ্গে আছেন উৎসাহী মহিলারা, তাঁরা সর্বপ্রকার সামাজিক ও আনন্দ অনুষ্ঠানে প্রথমেই এগিয়ে আসেন। এর কারণ স্পষ্ট। চাঁদা দেবার প্রশ্ন থাকে সেজন্য পুরুষমানুষকে ভেবে-চিন্তে এগোতে হয়। মহিলাদেরও সে-দায় নেই।

মহিলাদের কথা বলতে গিয়ে এবার সেই প্রথম অবাঙালী মহিলাটির কথা উঠবে বৈ কি—সেই যিনি আমাকে সুন্দর ইংরেজিতে চিঠি দিচ্ছেলেন। যে চিঠিখানায় তাঁর সম্পূর্ণ ঠিকানাটি ছিল, সেখানি সঙ্গে এনেছি বৈ কি। বয়স কম হলে সে-চিঠি পকেটে-পকেটেই ঘুরত, সন্দেহ কি ? কিন্তু ওটা আছে ফাইলে—ফাইল আছে রয়েল রেস্ট হাউসে। আগামীকাল চলে যাব, আজ সারা দিনটা রয়েছে তেলেগু প্রকাশকদের জন্য। আমার সমস্যা ছিল বিজয়ওয়াড়ার একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটেশ্বরলুকে নিয়ে, তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিনে গত কয়েক বছর। ওখানকার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত আমাকে নিয়ে গেলেন 'প্রভাকরে'র অপিসে। এঁর নাম প্রভাকর রাও, প্রসিদ্ধ অনুবাদক শ্রীযুক্ত চক্রপানর ছেলে ইনি, এবং এঁরাই

হলেন যুবাপ্রেসের কর্তা। এদের বই ও সাময়িক পত্রিকার কারবার মস্তবড়। এঁরা ছড়িয়ে আছেন মাদ্রাজ পর্যন্ত। কিন্তু ওঁদের খাতা-পত্রে আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটেশ্বরলুর যে পরিচয়টি পেলুম তাতে আমার চক্ষুস্থির। আমার সঙ্গের ফাইলটিতে ভেঙ্কটেশ্বরলুর চিঠিপত্র পড়ে প্রভাকরের চক্ষুও স্থির। রাজনীতিক ভাষায় যাকে বলে কায়েমী স্বার্থের প্রতিষ্ঠা—এও তাই, সেনগুপ্ত হঠাৎ ঘুষি পাকিয়ে বলে উঠলেন, আপনি হাইকোর্টে নালিশ ঠুকুন। আমি হাসলুম। তাহলে ভারতবর্ষের অন্তত গুটি দশেক হাইকোর্টে আমার যাওয়া উচিত। কিন্তু বন্য হাঁসের পিছনে ছুটবার সময় আর আমার নেই। বাঙালী লেখকরা এভাবে মার খাচ্ছে বহুকাল থেকে সান্ত্বনা এই, সততার সঙ্গে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা এবার একে একে এগিয়ে আসছেন।

অতঃপর একখানা স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম। সঙ্গে ছিল সেই মহিলার চিঠিখানা। স্কুটারের ছোট ছোট চারখানা চাকা হায়দারাবাদের প্রায় সমস্ত শহরটা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে হায়দারাবাদের দিকে চলল। এটা নগর ছাড়িয়ে দক্ষিণের পথ। স্পষ্টত, নতুন-নতুন কলোনি এ অঞ্চলে নির্মাণ করা চলছে। হায়দারাবাদ বিস্তার লাভ করছে। যেমন বাঙ্গালোর নগর প্রসারিত হচ্ছে জয়নগরের দিকে, যেমন ত্রিবন্দরম্ স্ফীতিলাভ করছে তার বিমানবন্দরের দিকে, যেমন, দিল্লীর বিনয়নগর গ্রীনপার্ক টেগোর টাউন বা কাল্‌কাজি, যেমন ভূপালের পুরনো শহর ভেঙে যাচ্ছে, জয়পুর যেমন বেড়ে যাচ্ছে সিন্ধি কলোনির দিকে। কেউ কোথাও বসে নেই। সমগ্র ভারতের সর্বত্র চলেছে নির্মাণের কাজ এবং কোটি কোটি মানুষের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। রেওয়াড়ি ছাড়িয়ে হরিয়ানায় ঢুকলে অবাক হতে হয়। সেই পুরানো আমবালা আরে নেই। ফরাসী এঞ্জিনিয়ার লা কর্বুসিয়ে তৈরী করেছেন চণ্ডীগড়ে বিরাট নগরী—তার সেই সুবিশাল হ্রদের

ধার দিয়ে গান্ধীমণ্ডপ পর্যন্ত দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেদিন হিমালয়ের কাংড়া আর ধরমশালার ওদিক দিয়ে পুরনো কালের পথ ঘাট আর চিনতে পারিনি। তারপর সব দেখে ফিরে আসি পশ্চিমবঙ্গে! 'এ আমার এ তোমার পাপ, বিধাতার পক্ষে এই তাপ বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়। ভীরুর ভিরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ…।' না থাক্, বাংলায় মহাকবির মৃত্যু ঘটে গেছে!

সায়েদাবাদের প্রান্তে এক নিরিবিলি পল্লীতে যখন এসে পৌঁছলুম তখন আমার আঙুরের ঠোঙ্গা ফুরিয়ে গেছে! মনে পড়ে গেল, এক-কালে শ্যামবাজার পর্যন্ত ট্রাম চলত, তারপর থেকে উত্তর দিকে শুধু হাঁটা পথ। আমার বড় ভগ্নিপতি সেইকালে কয়লার কারবার করতেন। সন্ধ্যার পর তিনি টাকা-পয়সার থলি নিয়ে শ্যামবাজার থেকে হাঁটা দিতেন নিজের বাড়ির দিকে। সঙ্গে থাকত এক পয়সার ছোলাভাজা। পাকপাড়া, পল্টনপাড়া, সিঁথি, ও নোওয়াপাড়া ছাড়িয়ে তিনি যখন পালপাড়ার ফাঁড়ি পেরিয়ে বামনপাড়ার গলিতে পৌঁছতেন, তখন ওই এক পয়সার ছোলাভাজা চিবনো শেষ হয়ে যেতো।

হঠাৎ সামনে এক গলির মোড়ে দেখি কাছেই এক বাড়িতে এক বাঙালী ডাক্তারের নেম-প্লেট। নাম আর. কে. ব্যানার্জি। ভদ্র-লোককে ডাকলুম। আমি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াব, এ তাঁর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। তাঁর স্ত্রী বিস্ময়াহত। অতঃপর আপ্যায়নের পালা। দেখতে দেখতে দু'চারজন তেলেগু ভদ্রলোক এসে জমে গেলেন। স্কুটার ছেড়ে দিতে হল। ব্যানার্জি সরকারী ডাক্তার, তবু তাঁর গাড়ি আছে। আমার সঙ্গে যে ঠিকানাটা রয়েছে সেটি দেখালুম। ওরা বললেন, এইতো কাছেই, আসুন সঙ্গে যাই।

নতুন কলোনি। পথঘাট তখনও কাঁচা। পূব দিকে কতকটা

গিয়ে বাঁ হাতি বেঁকে ডান হাতি একতলা নতুন বাড়ি। আমার প্রয়োজনীয় মহিলাটির নাম বন্দনাকুমারী। একজন মহিলাকে সামনেই পাওয়া গেল, তাঁর কোলে একটি শিশুমেয়ে। কিন্তু বন্দনা-কুমারী যাঁর নাম, তিনি এখন বাড়ি নেই। তিনি বুঝি কলেজে অধ্যাপনা করেন। বাড়িতে অন্য কেউ ইংরেজি জানেন না, তাই কাথাবার্তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু বুঝলুম বছর তিনেকের ওই শিশুমেয়েটি পিসির কাঁধে চড়ে বিশেষ আবদার করছিল। এর বেশি আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল।

সুতরাং আমি আর কি করব—ফিরে যাচ্ছি। ওঁদের কাছে আমার রয়েল রেস্ট হাউসের ঠিকানাটা রেখে এলুম। বলে এলুম, আগামীকাল আমি মাদ্রাজ যাচ্ছি, সন্ধ্যার প্লেনে। অধ্যাপিকা বন্দনাকুমারী যদি ইচ্ছা করেন, আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন।

ডাক্তার আমাকে তাঁর গাড়িতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রৌদ্র চড়া হয়ে উঠেছিল। আমি যে ইতিমধ্যে হায়দারাবাদ জেলা চষে ফেলেছি, এটি তিনি শুনলেন। তাঁদের অতিথেয়তায় আমি আনন্দ পেয়েছিলুম।

সেনগুপ্ত বিকালের দিকে লালবাহাদুর স্টেডিয়ামের ক্লাবে নিয়ে গিয়ে আমাকে আপ্যায়ন করেছিলেন। আমি সাধারণত বাইরে গিয়ে ছদ্ম-পরিচয় নিয়ে ঘোরাঘুরি করি। এটি আমার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু এখানে তার সুযোগ ছিল না। যাই হোক, সেদিন ফিরবার পথে তেলেঙ্গানা প্রজাসমিতির এক জনসভার ধারে গিয়ে পুলিশের তোড়জোড় দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলুম। সে যেন এক বিরাট সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজন। অথচ ভায়োলেন্সের গন্ধও নেই কোথাও। দাবিদার বক্তৃতায় কিছু উত্তেজনা থাকেই, কিন্তু শ্রোতারা আধমরার মত শুনেই যাচ্ছে। তেলেঙ্গনার দাবি একটা কথার কচকচি মাত্র, সেখানে বিশেষ একটা দলের স্বার্থ টাই বড়, যুক্তির

জোর কম। আমরা বাঙালী। কাঁচালঙ্কা, সরষে বাটা, সরষের তেল—এসব আমাদের রক্তে। আমাদের মাথায় সর্বদা খুন চেপে থাকে। স্টেটবাসের ভিড়ের মধ্যে টিকিট চাইলে মারামারি, ট্রেনের বিনা-টিকিটের যাত্রীকে পাকড়াও করলে রক্তারক্তি, সাধারণ নির্বাচন মানে আমাদের কাছে রক্তপাতের কাল, মিছিল মানে খুনখারাপি, খেলার মাঠে হার-জিত যারই হোক—রক্তগঙ্গা। সিনেমায় টিকিট না পেলে মার শা-কে। ইস্কুল-কলেজে পরীক্ষা হলে টোকাটুকি, ধরা পড়লে মার শা-কে! আবার ওই হুজুগের সঙ্গে হয়তে মহাকবির একটি গানও ধরে দিল—'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে, আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো—'

আমরা বাঙালী! কাঁচালঙ্কার ঝাল, সরষের তেলের ঝাঁজ, তাজা রক্তাক্ত কাঁচা-ইলিশের ঝোল! রক্তে উল্লাস, রসে মশগুল, রঙে পাগল, রঙ্গে মাতোয়ারা!

যাবার সময় হল বিহঙ্গের, এখনই কুলায় রিক্ত হবে।

সকালবেলা বারান্দায় বসে খবরের কাগজ দেখছিলুম। আজ গা এলিয়ে থাকব, সন্ধ্যায় বিহঙ্গ উড়বে অন্ধকার আকাশ পথে। শিয়রে শুধু থাকবে শুক্লপক্ষের শশীকলা। এমনি সময় আমার সন্ধান নিয়ে এক সুশ্রী ও সৌম্যদর্শন যুবক সামনে এসে দাঁড়াল। সদ্যস্নাত, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, চোখে চশমা। হাতে একটি মস্ত কাগজের মোড়ক, এবং বাঁ কাঁধে একটি শিশু মেয়ে—বছর তিনেক বয়স। মেয়েটিকে চিনলুম।

নত নমস্কার জানিয়ে বয়স্ক যুবকটি বলল, আমি এখানকার কলেজে ইংরেজি পড়াই। এটি আমার মেয়ে। এরই নাম বন্দনাকুমারী।

• অ্যাঁ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এ আমার প্রথম সন্তান, বড়ই পয়মন্ত। এর নাম দিয়েই আপনাকে চিঠি দিতুম। এর নামেই লেখাগুলি ছাপা হয়। আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই প্রণামীটি গ্রহণ করুন।

যুবকটি অতি বিনীতভাবে মোড়কটি আমার সামনে রাখল। পরে বলল, এর মধ্যে একখানি অয়েল-পেন্টিং আছে, আমারই হাতে আঁকা।

শিশু বন্দনাকুমারীকে একটু আদরও জানালুম। দরকারী কথাবার্তা নিয়ে যুবকটি প্রায় আধঘণ্টা আলাপ করে একসময় বিদায় নিল। আমি হাসব কি রাগ করব, বুঝতেই পারলুম না।

স্নানাদি সেরে মধ্যহ্নকালে রেষ্টুরেণ্টে যাবার আগে এক সময় উপহারের মোড়কটি খুলে বসলুম। ভিতরে এক কেজি আন্দাজ শ্রেষ্ঠ আঙুর, গোটা আষ্টেক সবুজবর্ণের মেঠাই, একখানি হাতে-আঁকা বিরহিনী শ্রীরাধিকার তৈলচিত্র, এবং সর্বশেষে আমার নাম লেখা একখানি খামের চিঠি। খাম খুলে দেখি চিঠি নয়, একখানা একশো টাকার নোট।

শিশু বন্দনাকুমারী বড়ই পয়মন্ত !

শেষ